চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানাধীন কদলপুর গ্রামের জাতিবর্ণ ব্যবস্থা

শিপ্রা সরকার

Dhaka University Library
449625
449625

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ
সেপ্টেম্বর ২০১০

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, 'চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানাধীন কদলপুর গ্রামের জাতিবর্ণ ব্যবস্থা' শীর্ষক এই অভিসন্দর্ভ এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য আমি রচনা করেছি এবং তা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দিয়েছি। এই অভিসন্দর্ভ কিংবা এর কোনো অংশ কোথাও প্রকাশ করি নি, কিংবা অন্য কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করি নি।

449625

(ড. আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী)
প্রফেসর, নৃবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ১০০০
এবং
গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক

(শিপ্রা সরকার)
এম. ফিল. গবেষক
নৃবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা ১০০০

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গকথা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য বর্তমান অভিসন্দর্ভ রচিত হয়েছে। আমার এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ডক্টর আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী। তাঁর সুচিন্তিত পরামর্শ ও প্রাজ্ঞ-বিবেচনা আমার গবেষণাকর্মকে সহজসাধ্য করে দিয়েছে। গবেষণা অভিসন্দর্ভের সামগ্রিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও রূপরেখা নির্মাণে তাঁর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারও আমি ব্যবহার করেছি। শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়কের পৌনঃপুনিক তাগাদা সত্ত্বেও বক্ষ্যমাণ অভিসন্দর্ভ সম্পন্ন করতে ব্যক্তিগত অসুবিধার কারণে অনেক বিলম্ব ঘটেছে। শেষ পর্যন্ত অভিসন্দর্ভটি যে পরীক্ষার জন্য উপস্থাপন করতে সক্ষম হলাম, সেক্ষেত্রেও তাঁর অনুপ্রেরণা ও আশ্রয় ছিল আমার অন্যতম শক্তিউৎস। তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতা ও ঋণ অপরিসীম।

449625

গবেষণাকর্মের বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁদের কাছ থেকে সুচিন্তিত পরামর্শ, সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়েছি, তাঁরা হচ্ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ডক্টর জাহিদুল ইসলাম; সমাজবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন প্রফেসর ডক্টর রংগলাল সেন, ডক্টর মুহাম্মাদ হাবিবুর রহমান এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের প্রাক্তন প্রফেসর ডক্টর অনুপম সেন ও ডক্টর এ. এফ. এম. ইমাম আলী। এঁদের সকলের কাছে আমি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

মাঠ-পর্যায়ে গবেষণার কৌশল ও পদ্ধতি সম্পর্কে আমাকে বিশেষভাবে ধারণা দেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বখ্যাত ফোকলোরবিদ প্রফেসর হেনরি গ্ল্যাসি। এ বিষয়ে কয়েকটি গ্রন্থ দিয়েও তিনি আমাকে সাহায্য করেছেন। এছাড়াও আমি সাহায্য পেয়েছি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেনসালভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. মার্গারেট মিলস্, ভারতের মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোরবিদ ড. জওহরলাল হাণ্ডু এবং বিখ্যাত ফোকলোরবিদ ও ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রফেসর ড. বরুণকুমার চক্রবর্তীর কাছ থেকে। বিশ্বখ্যাত এই পণ্ডিতদের কাছে আমি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণাকর্মের সময় নানা পর্যায়ে আমি চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানাধীন কদলপুর গ্রামে উপাত্ত সংগ্রহের কাজ করি। ওই পর্যায়ে উক্ত গ্রামের জনসাধারণ আমাকে যেভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন, তা আমি গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। এক্ষেত্রে কদলপুর গ্রামের শ্রী আশুতোষ চক্রবর্তী, শ্রী সন্তোষকুমার আচার্য, শ্রী বীরেন্দ্রলাল দত্ত, শ্রী রাখাল চন্দ্র দে, শ্রী গোবিন্দ সরকার, শ্রী কাজল সরকার, জনাব কাজী শাহ আলম, শ্রী সুবোধ বড়ুয়া, শ্রী রতন দে, দিলরুবা সুলতানা, শ্রীমতী মিনতী দে এবং শ্রী হারাধন মণ্ডলের কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি। তথ্যসংগ্রহের সময় তাঁরা যেভাবে আমাকে গ্রহণ করেছেন তাতে আমাকে তাঁদের গ্রামেরই একজন অধিবাসী বলে মনে হয়েছে। কদলপুর গ্রামের সাধারণ মানুষ, যাঁরা আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন, তাঁদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এখানে বীরেন্দ্রলাল দত্তের কথা আমাকে বিশেষভাবে বলতে হয়। অশীতিপর এই বৃদ্ধ, যিনি মাঠ পর্যায়ে গবেষণার সময় আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন, সম্প্রতি পরলোকগমন করেছেন। তাঁর স্মৃতির প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

কদলপুর গ্রামে ক্ষেত্রানুসন্ধান কালে আমি অবস্থান করি শ্রী কাজল সরকারের বাড়িতে। ওই বাড়ির সকলেই আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। বিশেষ করে ক্ষেত্রানুসন্ধানের সময় আমার সঙ্গে এ-বাড়ি থেকে সে-বাড়ি গিয়েছেন কাজল সরকারের স্ত্রী শ্রীমতী পম্পি সরকার। এই পরিবারের প্রতি আমি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

গবেষণাকালে আমি প্রধানত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার এবং বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। এ সূত্রে ওই দুই প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারিবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

শিপ্রা সরকার

এম. ফিল. গবেষক

নৃবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ১০০০

Dhaka University Institutional Repository

সূচি

প্রসঙ্গকথা ০৩

প্রথম অধ্যায় : অবতরণিকা ০৭

দ্বিতীয় অধ্যায় : ভারতীয় জাতিবর্ণ ব্যবস্থা : একটি পর্যালোচনা ২৬

তৃতীয় অধ্যায় : কদলপুর গ্রামের আর্থ-সামাজিক-ভৌগোলিক পরিচিতি ৪৭

চতুর্থ অধ্যায় : কদলপুর গ্রামের জাতিবর্ণ ব্যবস্থা ৬২

প্রথম পরিচ্ছেদ : হিন্দু সমাজে জাতিবর্ণ ব্যবস্থা ৬৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : মুসলিম সমাজের সামাজিক স্তরবিন্যাস ও জাতিবর্ণ ব্যবস্থার প্রভাব ৮৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : জাতিবর্ণ ব্যবস্থায় পরিবর্তন-প্রবণতা ৯০

উপসংহার ৯৮

পরিশিষ্ট : গ্রন্থপঞ্জি ১০১

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-সঙ্কেত

সারণি ১ : কদলপুর গ্রামের ভৌগোলিক অবস্থান ৪৯

সারণি ২ : কদলপুর গ্রামের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর সংখ্যাতাত্ত্বিক পরিচিতি ৫১

সারণি ৩ : কদলপুর গ্রামের হিন্দু জনগোষ্ঠীর বর্ণগত তথ্য ৫২

সারণি ৪ : অ-ব্রাহ্মণ উচ্চ-বর্ণের হিন্দুদের সংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্য ৫২

সারণি ৫ : নিম্ন-বর্ণের হিন্দুদের সংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্য ৫৩

সারণি ৬ : নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্য ৫৪

সারণি ৭ : মুসলিম জনগোষ্ঠীর সংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্য ৫৫

সারণি ৮ : কদলপুর গ্রামের বিভিন্ন পাড়া ৫৬

সারণি ৯ : কদলপুর গ্রামের পাড়াভিত্তিক গৃহস্থ ও জনসংখ্যার তথ্য ৫৭

সারণি ১০ : জমির মালিকানার ভিত্তিতে কদলপুর গ্রামের গৃহস্থদের তথ্য ৫৮

সারণি ১১ : পেশাগত তথ্য ৫৯

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

অবতরণিকা

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

অবতরণিকা

প্রস্তাবনা

ভারতবর্ষীয় হিন্দু সমাজ হল সনাতন জাতিবর্ণ ব্যবস্থার (caste system) একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত। প্রধানত বংশানুক্রমকে ভিত্তি করে সমাজে যে শ্রেণীব্যবস্থা গড়ে ওঠে, তাকেই বলা হয় জাতিবর্ণ ব্যবস্থা। জাতিবর্ণ ব্যবস্থার বিকাশের ফলে হিন্দু ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠী নানা ধরনের মর্যাদাগত বিভাজনে বিভক্ত হয়ে পড়ে। জাতিবর্ণ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সৃষ্ট গোষ্ঠীসমূহ সামাজিক অধিকার, দায়িত্ব, মর্যাদা ও জীবনচর্যায় একে অন্য থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও সুনির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে। প্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষের হিন্দুসমাজে জাতিবর্ণ ব্যবস্থা খুবই সক্রিয় ও প্রভাব-বিস্তারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে সমাজকাঠামো নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। জাতিবর্ণ ব্যবস্থার এই প্রভাব বর্তমান কালেও, নানা রূপ-রূপান্তরের মধ্য দিয়ে, ক্রিয়াশীল রয়েছে। বাংলাদেশের হিন্দুসমাজে জাতিবর্ণ ব্যবস্থার প্রভাব ও তার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে অ্যাকাডেমিক পর্যায়ে কোনো নৃতাত্ত্বিক গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। কোনো কোনো বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধে, কিংবা কোনো গ্রন্থে এ বিষয়ে সামান্য আলোচনা সংযুক্ত হয়েছে মাত্র। কোনো একটি নির্দিষ্ট এলাকা নির্বাচন করে সামগ্রিক কোনো নৃতাত্ত্বিক গবেষণা হয় নি। এই অভাবের কথা বিবেচনা করেই আমরা বর্তমান গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করতে অগ্রহী হয়েছি।

জাতিবর্ণ ব্যবস্থার সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য এবং কালস্রোতে সনাতন এই ব্যবস্থার পরিবর্তন ধারা পর্যবেক্ষণ করা বিশেষভাবে জরুরি। কেননা, এভাবে চিন্তা করলে পরিবর্তনের যে ধারা ও প্রবণতা পরিলক্ষিত হবে, বস্তুত তার মধ্য দিয়ে সমাজস্রোতের সামগ্রিক পরিবর্তনের একটি আভাস পাওয়া যাবে বলে আমাদের বিশ্বাস। কাজেই জাতিবর্ণ ব্যবস্থা বিষয়ে গবেষণা কেবল ওই ব্যবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, সেখানে সমাজের নানা প্রবণতার একটা আভাস পাওয়াও সম্ভব। বর্তমান গবেষণাকর্ম পরিচালনার সময়ে

Dhaka University Institutional Repository

এ বিষয়েও আমাদের বিশেষ নজর রাখতে হয়েছে। জাতিবর্ণ ব্যবস্থার মধ্যে যেসব পরিবর্তনের সূত্র পাওয়া যায় তার মাধ্যমে সমাজের গতিশীলতা এবং একটা স্থির ব্যবস্থার মধ্যে বংশানুক্রমিকভাবে আবদ্ধ কিছু মানুষের পরিবর্তমান সময়ের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করা যায়।

গুরুত্ব

সামাজিক স্তরবিন্যাসের একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হচ্ছে জাতিবর্ণ ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা ভারতবর্ষীয় সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রথা। সুপ্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষ তথা বাংলায় জাতিবর্ণ ব্যবস্থা ক্রিয়াশীল আছে। বাংলার সামাজিক কাঠামো এবং ধর্মাচরণের সঙ্গে জাতিবর্ণ ব্যবস্থা গভীরভাবে সম্পৃক্ত। চতুর্বর্ণ ভিত্তিক জাতিবর্ণ ব্যবস্থা সামাজিক স্তরবিন্যাস ব্যাখ্যার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং অতি প্রাসঙ্গিক একটি বিষয়। অথচ বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাস ব্যাখ্যায় এ ধারায় পূর্ণাঙ্গ কোনো গবেষণার কথা আমাদের জানা নেই। বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাস ব্যাখ্যায় যে-সব সমাজ-নৃবিজ্ঞানী গবেষণা করেছেন তারা নানা দৃষ্টিকোণে স্তরবিন্যাস বিশ্লেষণ করলেও জাতিবর্ণ ব্যবস্থা-বিষয়ক আলোচনা ততটা গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেননি। তাদের গবেষণায় অর্থনৈতিক স্তরবিন্যাসটাই প্রাধান্য পেয়েছে, জাতিবর্ণ-বিষয়ক আলোচনা থেকে গেছে গৌণ। সেদিক বিবেচনায়, বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাস সম্পর্কিত ব্যাখ্যার ধারায় বক্ষ্যমাণ গবেষণা সঞ্চার করতে পারে স্বতন্ত্র মাত্রা। বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থা বিশেষত হিন্দুসমাজে জাতিবর্ণ ব্যবস্থার স্বরূপ, ওই ব্যবস্থায় পরিবর্তনের প্রবণতা এবং মুসলিম সমাজের উপর চতুর্বর্ণ ব্যবস্থার প্রভাব— ইত্যাদি প্রসঙ্গ সামাজিক স্তরবিন্যাস সম্পর্কিত আমাদের জ্ঞানকে সম্প্রসারিত করতে পারে। এসব প্রসঙ্গ বিবেচনা করলে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বর্তমান গবেষণাকর্ম বাংলাদেশে সমাজ-নৃবিজ্ঞান গবেষণার ধারায় যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করতে সক্ষম।

বাংলাদেশে নৃতাত্ত্বিক যেসব গবেষণা হয়েছে, তার মধ্যে জাতিবর্ণ ব্যবস্থাই সম্ভবত সব চেয়ে কম গবেষণালব্ধ বিষয়। গ্রাম-গবেষণার ধারাতেও জাতিবর্ণ ব্যবস্থা সম্পর্কে গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখযোগ্য কোনো কাজ সম্পন্ন হয় নি। কাজেই আমরা ধারণা করি, বর্তমান গবেষণাকর্ম বাংলাদেশের জাতিবর্ণ ব্যবস্থা এবং এই ব্যবস্থার সাম্প্রতিক প্রবণতা সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা উপস্থাপন করবে। এ গবেষণাকর্ম সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের যেমন কাজে লাগবে, তেমনি বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজকাঠামোতে জাতিবর্ণ ব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা ও গ্রামীণ সামাজিক স্তরবিন্যাস

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্কে জানতে আগ্রহী পরিকল্পনাবিদ ও নীতি-নির্ধারকদের ব্যবহারিক কাজে লাগবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণাকর্ম ক্ষেত্রানুসন্ধান (Fildwork research) ও প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণমূলক (Participant Observation) পদ্ধতিতে নিষ্পন্ন হয়েছে। এই গবেষণাসন্দর্ভে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানাধীন কদলপুর গ্রামের জাতিবর্ণ ব্যবস্থার উপর আলোকপাত করা হয়েছে। গবেষণা এলাকার হিন্দুসমাজে জাতিবর্ণ ব্যবস্থার ক্রিয়াশীল প্রথা ও পরিবর্তমান প্রবণতার উপরেই বর্তমান গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। প্রসঙ্গত, মুসলিম সমাজের উপর জাতিবর্ণ ব্যবস্থার প্রভাব সম্পর্কেও এখানে আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। লেখাই বাহুল্য যে, বর্তমান গবেষণাকর্মটি একটি নৃতাত্ত্বিক গবেষণা। নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতিই শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি বলে স্বীকৃত। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় গবেষকের এই মন্তব্য—

> The anthropological method, which involves direct participation and observation in the field seems to us the most useful method for the study of village communities in contemporary Bangladesh. Because we think we can gain insights into the society and culture of the people whom we are investigating through intensive fieldwork.[২]

অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহের জন্য তিন পর্যায়ে মোট সাত মাস আমি কদলপুর গ্রামে অবস্থান করি। জাতিবর্ণ ব্যবস্থার নানা খুঁটি-নাটি জানতে আমি কোনো গ্রামবাসীকে কখনো তেমন কোনো প্রশ্ন করিনি; কেবল পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা করেছি, তারা কি করছে, কীভাবে করছে। অন্যান্য কৌশল গ্রহণ করলেও তথ্যানুসন্ধানে আমার প্রধান পদ্ধতি ছিল প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ। কদলপুর গ্রামে থাকার সময়ে জাতিবর্ণ ব্যবস্থার সবদিক জানার জন্য আমি সুপরিকল্পিতভাবে প্রয়াস চালাই। আমি সবার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেছি, অনেকের বাড়িতে খেয়েছি, অনেক অনুষ্ঠানে নিবিড়ভাবে অংশগ্রহণ করেছি। ফলে তাদের সঙ্গে আমার গভীর সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ ঘটেছে। কদলপুর গ্রামে তথ্যানুসন্ধানের সময় ম্যালিনোস্কির

Dhaka University Institutional Repository

একটি বিশেষ মন্তব্য দ্বারা আমি সব সময় অনুপ্রাণিত থাকার চেষ্টা করেছি। আমার যে-কোনো পরিকল্পনার সময়েই মনে পড়তো ম্যালিনোস্কির এই কথা—

> Living in the village with no other business but to follow native life, one sees the customs, ceremonies and transactions over and over again, one has examples of their beliefs as they are actually lived through, and the full body and blood of actual native life fills out soon the skeleton of abstract constructions.[৩]

জাতিবর্ণ ব্যবস্থা বা সামাজিক স্তরবিন্যাস গবেষণায় পূর্বসূরী সকল গবেষকের মাঝেই ম্যালিনোস্কির এই অভিমতের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। গ্রাম-গবেষণার গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী এ. কে. নাজমুল করিম লিখেছেন—

> It seems to me that we can possibly get a picture of the Muslim society better by anthropological study of a pre-dominantly Muslim village of East Pakistan than by the simple assemblage of a huge mass of statistical data. In the absence of any significant scientific information about Bengali Muslim society, anthropological studies of small magnitude will help us a great deal in getting a correct glimpse into our societal mechanism.[৪]

একটি দেশের সমাজকাঠামোর বিশেষ কোনো প্রসঙ্গ সম্পর্কে জানতে হলে গ্রাম-গবেষণার কোনো বিকল্প নেই। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী রামকৃষ্ণ মুখার্জীর অভিমত উল্লেখ করা যায়। রামকৃষ্ণ মুখার্জী লিখেছেন—"একটি জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক (আদর্শগত বিষয়সহ) বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে কার্যকারণ বা সহযোগিতার যে সম্পর্ক রয়েছে, তা একটি বিশেষ সামাজিক সংগঠন সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে এবং সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে একটি আদর্শবোধ নির্মাণে সহায়ক হয়েছে। প্রবহমাণ, কাঠামোগত ও কার্যগত সম্পর্কগুলোই হয়তো সমাজ সংহতি রক্ষা করেছে ; নয়তো স্ব স্ব ক্ষেত্রে পরিবর্তনের ধারাকে সুগম করেছে। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত না গ্রাম সমীক্ষায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিশেষত্বগুলো এক সংকটময় বিন্দুতে মিলিত হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রামীণ জীবনের সার্থক চিত্র এবং গ্রামীণ সমাজের সুসংহত গতিশীলতা অনুধাবন করা সম্ভব নয়।"[৪] একই ধরনের অভিমত ব্যক্ত করেছেন বিখ্যাত নৃবিজ্ঞানী

Dhaka University Institutional Repository

Andre Beteille, যিনি ভারতের একটি গ্রামের জাতিবর্ণ ব্যবস্থা, শ্রেণী ও ক্ষমতার উপর গবেষণা করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। Beteille লিখেছেন—

> Despite the absence of clearly defined procedures for making intensive field studies, a great deal of the systematic information that we have about social reality in contemporary India is based on this kind of study. Some of our best insights into kinship, religion and local level politics come from intensive studies made by social anthropologists using the method of participant observation. Although this approach has so far been used mainly in the study of village communities, it can be applied to the investigation of practically any sector of contemporary society.[৪]

গ্রাম-গবেষণার আলোকেই একটি বৃহৎ সমাজের বিশেষ কোনো সমাজতাত্ত্বিক বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়া যায়। এ প্রসঙ্গটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নৃবিজ্ঞানী Andre Beteille লিখেছেন —

> The relations between a single village and the wider social system of which it forms a part are complex, and very little will be gained by discussing at the outset these relations in abstract and formal terms. Suffice it to say that it is possible to study within the framework of a single village many forms of social relations which are of general occurrence throughout the area.[৫]

পূর্বেই ব্যক্ত হয়েছে যে, বর্তমান গবেষণাকর্ম পরিচালনার জন্য তিন পর্যায়ে আমি মোট সাত মাস কদলপুর গ্রামে অবস্থান করি। কদলপুর গ্রামে আমি প্রথমে যাই ২০০৬ সালের নভেম্বর মাসে। একটানা তিন মাস সেখানে অবস্থান করি। ২০০৭ সালের জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে আমি কদলপুর গ্রাম থেকে চলে আসি। পুনরায় তথ্যানুসন্ধানের জন্য আমি কদলপুর যাই ২০০৮ সালের অক্টোবর মাসে। টানা তিন মাস সেখানে অবস্থান করি। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ শেষ করি। কিন্তু শেষ পর্যায়ে নতুন কিছু তথ্য সংগ্রহের জন্য ২০০৯ সালের এপ্রিল

Dhaka University Institutional Repository

মাসে আমি পুনরায় কদলপুর যাই। তৃতীয় পর্যায়ে একমাস সেখানে অবস্থান করি। তৃতীয় পর্যায়ে খুঁটি-নাটি কিছু তথ্যের জন্য আমি গ্রামবাসীদের কাছে প্রশ্নের সহায়তা গ্রহণ করি। প্রথম দু'পর্যায়ে ছয় মাস উক্ত গ্রামে আমার অবস্থানের কারণে তৃতীয় পর্যায়ে প্রশ্নের মাধ্যমে তথ্যসংগ্রহে আমাকে তেমন বেগ পেতে হয়নি। কদলপুর গ্রামের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ অধিবাসী হিন্দু ধর্মাবলম্বী। বাকি ১০ ভাগের মধ্যে আছে ইসলাম এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষ। হিন্দু জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাতিবর্ণ ব্যবস্থা অনুযায়ী তিন বর্ণের মানুষ রয়েছে কদলপুর গ্রামে। এই বর্ণত্রয় হচ্ছে উচ্চ-বর্ণ, নিম্ন-বর্ণ এবং নমঃশূদ্র। সনাতন ধারণার ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বর্ণের কোনো অস্তিত্ব কদলপুর গ্রামে এখন আর নেই। এই দুই বর্ণই কালের প্রবহমাণতায় উচ্চ-বর্ণ এবং নিম্ন-বর্ণ নাম পরিগ্রহ করেছে। এমন বিভাজনের অস্তিত্ব কদলপুরের মতো বাংলাদেশের প্রায় সকল গ্রামেই লক্ষ করা যাবে। কদলপুর গ্রামের জাতিবর্ণ ব্যবস্থা এখন এভাবে নির্দেশ করা যায়—(ক). উচ্চ-বর্ণ (upper caste), (খ). নিম্ন-বর্ণ (lower caste) এবং (গ). নমঃশূদ্র (scheduled caste)। উচ্চ-বর্ণের মাঝে আছে আবার প্রধান দুটি বিভাজন—১. ব্রাহ্মণ (Brahmans) এবং ২. অন্যান্য উচ্চ-বর্ণ (Other upper caste)। বর্তমান অভিসন্দর্ভের চতুর্থ অধ্যায়ে কদলপুর গ্রামের এই ত্রিমাত্রিক বর্ণ-ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তৃত ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হয়েছে।

মুসলিম সমাজে হিন্দু সমাজের মতো চতুর্বর্ণ ব্যবস্থা প্রচলিত না থাকলেও একটা গোপন বিভাজন সেখানেও ক্রিয়াশীল। কদলপুর গ্রামের মুসলিম জনগোষ্ঠী খান্দান মুসলিম (অভিজাত শ্রেণী) এবং গৃহস্থ মুসলিম (নিম্নস্তরের মানুষ)—এই দুই ভাগে বিভক্ত। খান্দান মুসলিমরা সমাজে উচ্চ মর্যাদা ভোগ করে থাকেন। গৃহস্থ মুসলিমদের অবস্থান একেবারে নিচু স্তরে (bottom of the bottom)।

কদলপুর গ্রামে মাত্র দুই পরিবার বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর বাস। বৌদ্ধদের মধ্যে সামাজিক কোনো স্তরবিভাজন না থাকলেও উক্ত দুই ঘর সমাজে অভিজাত শ্রেণী বলেই স্বীকৃতি পেয়ে আসছে। গ্রামীণ সমাজে এই দুই বৌদ্ধ পরিবার অতি উচ্চ সম্মান ও মর্যাদা ভোগ করে থাকেন।

কদলপুর গ্রামের হিন্দু সমাজের জাতিবর্ণ ব্যবস্থা বা সামাজিক স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে লক্ষ করা গেছে জমির মালিকানার একটি বিশাল ভূমিকা রয়েছে। সামাজিকভাবে নিচু বর্ণের

Dhaka University Institutional Repository

হয়েও একাধিক হিন্দু পরিবার নানা কৌশলে ক্রমে উচ্চস্তরে উত্তীর্ণ হয়েছেন, এমনকি পাল্টে গেছে তাদের বংশানুক্রমিক পরিচিতি ও মর্যাদা। একই প্রবণতা আমরা মুসলিম সমাজেও লক্ষ করি। সামাজিকভাবে গৃহস্থ স্তরের কোনো কোনো মুসলিম পরিবার অর্থের শক্তিতে এবং ভূমির মালিকানার কারণে অন্যদের তুলনায় মর্যাদার স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছে।

হিন্দুসমাজে জাতিবর্ণ ব্যবস্থায় একটি বিশেষ স্তরের মাঝেও আবার বিভাজন পরিলক্ষিত হয়। হিন্দুসমাজে অধঃস্তনক্রম সাধারণত নির্ধারিত হয় শাস্ত্রীয় পবিত্রতা-অপবিত্রতার ধারণা (ritual pollution and purity) দ্বারা; পক্ষান্তরে মুসলিম সমাজে সামাজিক স্তরবিন্যাসে ক্রিয়াশীল থাকে জমির মালিকানা, শিক্ষা, জীবনধারা ইত্যাদি অনুষঙ্গ। বিশিষ্ট নৃবিজ্ঞানী আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরীর পর্যবেক্ষণ এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। ঢাকা জেলার মেহেরপুর গ্রামে তিনিও লক্ষ করেছেন—

> The Hindues of the village are mainly divided into upper caste, lower caste and scheduled caste. There are a number of hierarchical endogamous divisions among the upper, lower and scheduled castes. The Hindu caste hierarchy is mainly based on ritual pollution and purity, while the Muslim status groups are based on the traditional ownership and control of land, education and on differences in styles of life.[৭]

জাতিবর্ণ ব্যবস্থা এবং সামাজিক স্তরবিভাজনের ধারায় অধিবাসীদের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে জমির মালিকানা কিংবা ভূমিহীনতা কদলপুর গ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। হিন্দু এবং মুসলিম—উভয় ক্ষেত্রেই ভূমির মালিক এবং ভূমিহীন মানুষ এই দুই ধারা লক্ষ করা গেছে। মুসলিম সমাজে ভূমিহীন মানুষেরা সাধারণত কামলা বা দিনমজুর হিসেবে আখ্যায়িত হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে, হিন্দু সমাজে ভূমিহীন অধিবাসীরা নানা পেশায় নিয়োজিত হয়। মৃৎশিল্পী, জেলে, কাঠ-মিস্ত্রি, চর্মকার, মুচি, মুটে-বাহক—এইসব মানুষ হিন্দু সমাজে নিম্নস্তরের বা নিম্ন-বর্ণের মানুষ হিসেবে পরিচিতি পায়।

কদলপুর গ্রামে অবস্থানের সময় আমি পূর্ব-পরিচিত এক বন্ধুর বাড়িতে অবস্থান করি। পার্শ্ববর্তী আন্ধারমানিক গ্রামে আমার পৈত্রিক বাড়ি থাকার কারণে নানা কাজেই আমি বিশেষ সহায়তা লাভ করি। গ্রামবাসীরা আমাকে তাদের একজন হিসেবেই গ্রহণ করে।

Dhaka University Institutional Repository

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আন্ধারমানিক গ্রামে আমার পৈত্রিক বাড়ি থাকলেও আমরা সেখানে কখনো বাস করিনি। চট্টগ্রাম শহরেই আমরা বাস করি। সে-বিবেচনায় আন্ধারমানিক পৈত্রিক গ্রাম হলেও, আমার কাছে তা ছিল অপরিচিত এক জায়গা। তবু আমি আন্ধারমানিক নয়, কদলপুর গ্রামকে গবেষণা এলাকা হিসেবে নির্বাচন করি, যাতে আমার পর্যবেক্ষণ যথার্থ হয়।

কদলপুর গ্রামের জাতিবর্ণ ব্যবস্থা নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে তথ্যসংগ্রহের জন্য আমি পূর্বসূরী গবেষক, যারা জাতি-বর্ণ নিয়ে গবেষণা করেছেন, কিংবা গবেষণা করেছেন বিশেষ কোনো গ্রাম নিয়ে, তাদের গবেষণাকর্ম গভীর মনোযোগের সঙ্গে অধ্যয়ন করেছি। এ ধারায় যে সব গবেষণা আমার কাছে বিশেষ গুরুত্ববহ বলে মনে হয়েছে, তার মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় Andre Beteille-র *Caste, Class and Power : Changing Patterns of Stratification in a Tanjore Village* শীর্ষক গ্রন্থটি। এ গ্রন্থে Beteille দক্ষিণ ভারতের শ্রীপুরম নামের একটি গ্রামের জাতিবর্ণ, শ্রেণী এবং ক্ষমতা বিষয়ে তাৎপর্যপূর্ণ গবেষণা করেছেন। তাঁর গবেষণায় দেখা যায় গ্রামের বাসিন্দারা জাতিবর্ণের ভিত্তিতে ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণ এবং আদি-দ্রাবিড়ীয়—এই তিনটি স্তরে বিভক্ত। জমির মালিকানা সূত্রে নিম্ন-বর্ণের কোনো গ্রামবাসী ক্রমে ক্ষমতা লাভ করে উচ্চ-বর্ণে উঠে যায়—এ প্রবণতাও Beteille লক্ষ করেছেন। শ্রীপুরম গ্রামে জাতিবর্ণ বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে Beteille লক্ষ করেছেন প্রথাগত জাতিবর্ণ ব্যবস্থায় নানামাত্রিক পরিবর্তন এসেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় Beteille-র নিম্নোক্ত পর্যবেক্ষণ—

> Till the end of the nineteenth century caste played a part in almost every important sphere, and the social, economic, and political life of the village was dominated by the superiority of the Brahmins. Today many spheres of life have become relatively independent of caste, and the authority of the Brahmins, who once enjoyed what may be called decisive dominance, is challenged at every point.[৮]

প্রথাগত জাতিবর্ণ ব্যবস্থায় পদবী খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। পদবী থেকেই অনুধাবন করা সম্ভব জাতিবর্ণভিত্তিক স্তরবিন্যাসের কোন ক্রমে আছে বিশেষ কোনো ব্যক্তি।

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণত দেখা যায়, নিম্ন-বর্ণের কোনো ব্যক্তি নিজের পদবী বাদ দিয়ে উচ্চ-বর্ণের কোনো পদবী গ্রহণ করেছেন। প্রথম দিকে খানিকটা সামাজিক সমস্যা হলেও ক্রমে নতুন পদবীটাই ওই ব্যক্তির বংশানুক্রমিক পদবীতে পরিণত হয়। এই প্রবণতা Beteille-ও লক্ষ করেছেন তানজুরের শ্রীপুরম গ্রামে। Beteille লিখেছেন—

> Caste names among Non-Brahmins have been undergoing transformation by a process which seems to be fairly widespread. Members of a certain caste A begin to adopt a particular title or surname B and soon they return B as their caste name. As a consequence, members of the same caste may return different caste names, and sometimes members of different caste adopt the same title or caste name.[৯]

প্রযুক্তির বিকাশের ফলে অনেক জাতিগোষ্ঠীর প্রথাগত পেশা বদলে যাচ্ছে, বংশানুক্রমিক পেশা আর টিকে থাকতে পারছে না। ফলে বিশেষ কোনো জাতিবর্ণের মানুষের পেশাগত তথা সামগ্রিক পরিবর্তন ঘটছে। শ্রীপুরম গ্রামেও জাতিবর্ণ ব্যবস্থায় এই রূপান্তর প্রবণতা লক্ষ করেছেন Beteille। তিনি লিখেছেন—

> Today, with the disintegration of village handicrafts, many specialised castes have almost entirely lost their traditional occupation. Sometimes it happens that a community is a specialised caste only in its name, which is not infrequently that of some occupation historically associated with it, whereas in reality it can hardly be distinguished from the generality of cultivating caste.[১০]

Louis Dumont-এর *Homo Hierarchicus : The Caste System and Its Implications* শীর্ষক গ্রন্থটি একটি তাত্ত্বিক গ্রন্থ। বিশেষ কোনো গ্রাম-গবেষণা নয় আলোচ্য গ্রন্থ। এখানে জাতিবর্ণ ব্যবস্থা এবং সে-ব্যবস্থায় পরিবর্তন সম্পর্কে বিস্তারিত তাত্ত্বিক আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। Dumont তাঁর রচনায় জাতি ও বর্ণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরেছেন। তিনি লক্ষ করেছেন ভারতবর্ষের প্রথাগত জাতিবর্ণ ব্যবস্থায় এক বর্ণের মধ্যেই আবার বহু জাতি বা উপ-জাতির অস্তিত্ব ক্রিয়াশীল রয়েছে। Dumont লিখেছেন—"The caste, unified from the outside, is divided within. More generally, a particular caste is a complex group, a successive

Dhaka University Institutional Repository

inclusion of groups of diverse orders or levels, in which different functions (profession, endogamy, etc.) are attached to different levels."[১১] Dumont লক্ষ করেছেন ভারতীয় সমাজে জাতিবর্ণ ব্যবস্থার প্রধান ভিত্তি হচ্ছে শাস্ত্রীয় পবিত্রতা এবং অপবিত্রতার (ritual pollution and purity) ধারণা।

ভারতীয় জাতিবর্ণ ব্যবস্থা সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেছেন নৃবিজ্ঞানী G. S. Ghurye। *Caste And Race In India* শীর্ষক গ্রন্থে Ghurye কিছু মৌলিক পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেছেন। Dumont-এর মতো Ghurye-র গ্রন্থটিও ভারতীয় জাতিবর্ণ-বিষয়ক একটি তাত্ত্বিক গ্রন্থ। Ghurye ভারতবর্ষের প্রথাগত জাতিবর্ণ ব্যবস্থার প্রধান ভিত্তি হিসেবে ছয়টি বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করেছেন। এই বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে[১২]—

1. Segmental division of society :
2. Hierarchy;
3. Restrictions on feeding and social intercourse :
4. Civil and Religious disabilities and privileges of the different sections :
5. Lack of unrestricted choice of occupation :
6. Restriction on marriage.

Ghurye লক্ষ করেছেন, ব্রাহ্মণরাই নিজেদের স্বার্থে সমাজে জাতিবর্ণ ব্যবস্থা চালু করেছে। ব্রাহ্মণরা নিজেদের মর্ত্যলোকের ঈশ্বর বলে মনে করে। Ghurye লিখেছেন— "The Brahmins are declared to be Gods on earth. ...The functions of a Brahmin may be said to be teaching and officiating at sacrifices, and his aim was to be preeminent in sacred knowledge. To achieve this, a student's life (Brahmacharya) was enjoyed. To this course, it seems, only Brahmins were generally admitted."[১৩]

বিখ্যাত নৃবিজ্ঞানী M. N. Srinivas-এর *Village, Caste, Gender and Method* গ্রন্থে ভারতীয় জাতিবর্ণ ব্যবস্থা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। মহীশূরের রামপুরা নামক এক গ্রামের জাতিবর্ণ ব্যবস্থা সম্পর্কে গবেষণা করতে গিয়ে তিনি লক্ষ করেছেন জাতিবর্ণ ব্যবস্থায় সবচেয়ে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয় আন্তঃবিবাহ

Dhaka University Institutional Repository

(endogamy) এবং সেবাপরায়ণতা (commensality)। জাতিবর্ণ ব্যবস্থার উচ্চ-নীচতাই নির্ধারণ করে দেয় সামাজিক ক্রমোচ্চ ধারণা। Srinivas-এর ভাষায়—"The essence of hierarchy is the absence of equality among the units which form the whole: in this sense, the various castes in Rampura do form a hierarchy. The caste units are separated by endogamy and commensality, and they are associated with ranked differences of diet and occupation."[১৪]

Srinivas-এর মতে খাদ্য এবং পেশাও প্রথাগত জাতিবর্ণ ব্যবস্থার দুই প্রধান স্তম্ভ। খাদ্য এবং পেশার মাধ্যমেই একজন মানুষের জাতিবর্ণগত অবস্থান বা পরিচিতির ধারণা পাওয়া যায় বলে Srinivas মত প্রকাশ করেছেন। যখন কোনো ব্যক্তি উচ্চ-বর্ণে উত্তীর্ণ হতে চান, তিনি প্রথমেই যে-বর্ণে যেতে চান সে-বর্ণের খাদ্য আহার করেন, গ্রহণ করেন তার পেশা। Srinivas লিখেছেন—"When a caste wants to rise in the hierarchy, it may adopt the Brahminical diet. A striking example of this is provided by the Lingayats. Some Smiths also have adopt the Brahminical diet, but others have not. The latter are consequently regarded as inferior to the former."[১৫] Srinivas দক্ষিণ ভারতের রামপুরা গ্রামে জাতিবর্ণ ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন বা প্রবণতার কথা বলেছেন, চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানাধীন কদলপুর গ্রামেও আমরা সে-প্রবণতার উপস্থিতি লক্ষ করি। নিম্ন-বর্ণ থেকে উচ্চ-বর্ণে উত্তরণের প্রয়াস জাতিবর্ণ ব্যবস্থাধীন অনেক মানুষেরই স্বাভাবিক প্রবণতা বলে নৃবিজ্ঞানীরা উল্লেখ করেছেন।

ভারতীয় জাতিবর্ণ ব্যবস্থা সম্পর্কে গবেষণায় H. H. Risley-র অবদান বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। *Tribes and Caste of Bengal* (1892) এবং *The Peoples of India* (1908) গ্রন্থদ্বয়ে ভারতীয় জাতিবর্ণ ব্যবস্থা সম্পর্কে Risley-র ধারণাসমূহ ব্যক্ত হয়েছে। Risley লক্ষ করেছেন যে, ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায়, বিশেষত বাংলায় সাত ধরনের বর্ণপ্রথা চালু আছে। তাঁর পর্যবেক্ষণে এই সাত ধরনের বর্ণ হচ্ছে—

১. ব্রাহ্মণ। এরাই বর্ণপ্রথায় সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থান করে।

২. রাজপুত, বৈদ্য এবং কায়স্থ। এই তিনটি উপজাতি (sub-caste) নিয়ে গঠিত হয় দ্বিতীয় বর্ণ।

Dhaka University Institutional Repository

৩. ব্যবসায়ী, পান উৎপাদনকারী, তৈল প্রস্তুতকারী এবং বিক্রেতা, মালী, মৃৎশিল্পী, নাপিত এবং জলচল শূদ্র (clean Sudras) নিয়ে গঠিত হয় তৃতীয় স্তর। সমাজে এদের কর্মী অথবা ব্রাহ্মণের সেবাকারী হিসেবে দেখা হয়।

৪. চতুর্থ স্তরে আছে কৈবর্ত বা জেলে এবং গোয়ালারা। এরাও জলচল হিসেবে স্বীকৃত। উচ্চ-বর্ণের কায়স্থরা এদের দেওয়া জল স্পর্শ করলেও, ব্রাহ্মণেরা তাদের দেওয়া জল গ্রহণ করে না।

৫. কতিপয় গোষ্ঠী নিয়ে একটা বিশেষ বর্ণভুক্ত মানুষ নিয়ে গড়ে ওঠে পঞ্চম বর্ণ, যাদের দেওয়া জল ব্রাহ্মণ তো দূরের কথা, উচ্চ-বর্ণের হিন্দুরাও গ্রহণ করে না। বৈষ্টম, সুবর্ণবণিকরা এই বর্ণভুক্ত মানুষ বলে Risley মত প্রকাশ করেছেন।

৬. ষষ্ঠ বর্ণে আছে অধিক সংখ্যক মানুষ, যারা বাগদী, জালিয়া কৈবর্ত, নমঃশূদ্র, পোদ প্রভৃতি নামে পরিচিত।

৭. সপ্তম স্তরে আছে একেবারে নিম্ন-বর্ণের মানুষ। এ স্তরে আছে ডোম, চামার, মুচি, বাউরি প্রভৃতি মানুষ।[১৬]

Risley যেভাবে জাতিবর্ণ ব্যবস্থা শনাক্ত করেছেন, পরবর্তী কালের নৃবিজ্ঞানীরা তার অনেক কিছু মেনে নিয়েছেন; তবে অনেকেই তাঁর সাতটি বিভাজন মেনে নেননি।[১৭]

শতদল দাশগুপ্ত *Caste Kinship and Community* (1986) শীর্ষক গ্রন্থে নিম্ন-বর্ণের বাগদী শ্রেণী নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা করেছেন। একটি বিশেষ জাতি নিয়ে গবেষণার কারণে এখানে জাতিবর্ণ ব্যবস্থা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা পাওয়া যায় না। অবশ্য লেখকের সে-উদ্দেশ্যও ছিল না। গবেষক নিজেই জানাচ্ছেন—"This book is based on an intensive study of the social organisation of the *Dule Bagdis*, a backward caste in the Jaynagar region of west Bengal, India. The *Dule Bagdis* are one of several sub-castes into which the *Bagdi* caste is divided and constitute an endogamous group localised in forty-five villages in the Jaynagar region."[১৮]

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের অনেক নৃবিজ্ঞানী সামাজিক স্তরবিন্যাস বিষয়ে গবেষণা করেছেন। তাঁদের কারো কারো রচনায় জাতিবর্ণ ব্যবস্থা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা না থাকলেও, এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পর্যবেক্ষণ উপস্থাপিত হয়েছে। এ ধারার গবেষণায় প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরীর *A Bangladesh Village : A Study of Social Stratification* (1978) গ্রন্থটির কথা। এই গ্রন্থে ঢাকা জেলার মেহেরপুর নামক গ্রামের সামাজিক স্তরবিন্যাস ব্যাখ্যা সূত্রে লেখক জাতিবর্ণ ব্যবস্থার উপরও বিস্তৃত আলোচনা তুলে ধরেছেন। গবেষকের পর্যবেক্ষণে মেহেরপুর গ্রামে হিন্দু জনগোষ্ঠীর মধ্যে তিনটি বর্ণ ধরা পড়েছে। এই বর্ণত্রয় হচ্ছে—

১. The upper caste Hindus :

২. The lower caste Hindus ; এবং

৩. The Scheduled caste Hindus.

—ত্রিমাত্রিক এই বিভাজনের ক্ষেত্রে আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরীর প্রধান ভিত্তি ছিল শাস্ত্রীয় পবিত্রতা ও অপবিত্রতার ধারণা। লেখকের মতে—"This division is hierarchial, based on the concept of purity and pollution and sanctioned by Hindu religion. Birth determines the position of an individual in the Hindu society of Meherpur" [১৯]

মেহেরপুর গ্রামের প্রতিটি বর্ণের মধ্যেই একাধিক উপ-জাতির (caste sub-divisions) অস্তিত্ব লক্ষ করেছেন আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী। তাঁর মতানুসারে ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ মিলে সৃষ্টি হয়েছে উচ্চ-বর্ণ (upper caste)। শূদ্ররা হচ্ছে নিম্ন-বর্ণ (lower caste)। নিম্নবর্ণের মধ্যে উপ-জাতি(caste sub-divisions) হিসেবে আছে সাউ, ধোপা, নাপিত, কুমার, গোয়ালা, মালি প্রভৃতি গোষ্ঠী। জেলে, কামার এবং সুতার—এদের সমবায়ে গড়ে উঠেছে মেহেরপুর গ্রামের নমঃশূদ্র বর্ণ (Scheduled caste)। নমঃশূদ্রদের মাঝেও আবার অনেক বিভাজন লক্ষ করেছেন আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী। প্রসঙ্গত তিনি লিখেছেন—"The Scheduled caste Hindus are also divided into a number of caste sub-divisions on the basis of superiority and inferiority."[২০]

Dhaka University Institutional Repository

মেহেরপুর গ্রামে হিন্দু সমাজে প্রচলিত জাতিবর্ণ ব্যবস্থার অনুরূপ এক ধরনের বিভাজন মুসলিম সমাজেও গবেষক লক্ষ করেছেন। মুসলিম সমাজেও উচ্চ এবং নিম্ন—এই দুই ধরনের বিভাজন ক্রিয়াশীল। গবেষক লিখেছেন—

> ...the Muslims of Meherpur are ranked as high and low in status. The high status Muslims of Meherpur are known as *khandans* and low status Muslims as *girhastas*. This is, of course, a broad classification of them. Each of these catagories is again sub-divided into a number of groups.[২১]

এ. এফ. ইমাম আলী *Hindu-Muslim Community in Bangladesh* শীর্ষক গ্রন্থে চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী থানাধীন ছারিয়া গ্রামের জাতিবর্ণ ব্যবস্থার উপর বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। অভিন্ন তাত্ত্বিক প্রত্যয়ের আলোকে মুসলিম এবং হিন্দু সমাজে প্রচলিত স্তরবিন্যাস ও জাতিবর্ণ ব্যবস্থার উপর দৃষ্টিপাতই ইমাম আলীর গবেষণার কেন্দ্রীয় অন্বিষ্ট। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় গবেষকের এই ভাষ্য—

> The main purpose of the study is to reveal social stratification among the Muslims and the Hindus with the same theoretical frame-work discussed earlier. Accordingly it is hypothesized that (a) Social stratification among the Muslims and the Hindus follows the caste pattern. The members in both the religious categories are divided into a number of hereditary groups. These groups are mutually exclusive and form a social hierarchy; (b) The degree of rigidity of caste stratification is indicated by the degree of unanimity among the numbers of a community in assigning a group of particulat rank.[২২]

ইমাম আলী লক্ষ করেছেন হিন্দু সমাজে জাতিবর্ণ ব্যবস্থার উচ্চ-নীচ স্তরের কারণে সকলে এক ধরনের ধর্মীয় আচার-আচরণ পালন করতে পারে না; কিন্তু মুসলিম সমাজে এক্ষেত্রে স্তরবিন্যাসগত বৈষম্য থাকলেও, ধর্মচর্চায় কোনো পার্থক্য নেই। হিন্দু সমাজে মৃতদেহের সমাধির জন্য পৃথক ব্যবস্থা ও স্থান রয়েছে—এক বর্ণের স্থানে অন্য বর্ণের মানুষের সমাধি নিষিদ্ধ, কিন্তু মুসলিম সমাজে এক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই। ইমাম আলী লিখেছেন—

Dhaka University Institutional Repository

> ...in both the religious categories, each caste has its own burial or cremation ground. Among the Muslims, in case of emergency one caste may use another caste's ground. But among the Hindus, each caste has no way but to use its own cremation ground. Thus, in this respect the Hindus are more rigid than the Muslims.[২২]

এ. কে. নাজমুল করিমসহ বাংলাদেশের আরো অনেক গবেষকের রচনায় সামাজিক স্তরবিন্যাস আলোচনা-সূত্রে জাতিবর্ণ ব্যবস্থা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। যেহেতু তাদের আলোচনার মূল বিষয়ের মধ্যে জাতিবর্ণ ব্যবস্থা ছিল না, তাই এ বিষয়ে বিস্তারিত কোনো বিবেচনা সেখানে পাওয়া যায় না। নয়নপুর গ্রামের সামাজিক স্তরবিন্যাসের উপর গবেষণা করতে গিয়ে এ. কে. নাজমুল করিম মুসলিম সমাজে যে-সব বিভাজন পেয়েছেন তা মর্যাদার ক্রমধারায় এভাবে উপস্থাপন করা যায়—চৌধুরী, খন্দকার, মুহুরী, ভূঁইয়া, ভূমির মালিক কৃষক, ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিক, দিনমজুর, কাঠুরে, গোলাম বা চাকর।[২৪] অপরদিকে হিন্দুসমাজের জাতিবর্ণ ব্যবস্থার সামূহিক পরিচয় নয়নপুর গ্রামে নেই। কেননা, এ গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে হিন্দু জনগোষ্ঠীর সংখ্যা খুব কম, শতকরা মাত্র ৫ ভাগ। সকল হিন্দুই নিম্ন-বর্ণের; তবে এই নিম্ন-বর্ণের মাঝেও আবার বিভাজন লক্ষ করেছেন নাজমুল করিম। তিনি লিখেছেন—

> In this village about 5 p. c. of the population are Hindus, all of whom belong to the lowest castes of the Hindu social order. The hierarchical order among them is as follows :
>
> 1. Potters,
> 2. Carpenters,
> 3. Weavers,
> 4. Laundrymen (some of them have adopted barber's occupation).[২৩]

বাংলাদেশের এবং ভারতের আরো অনেক লেখক-গবেষক জাতিবর্ণ ব্যবস্থার উপর আলোকপাত করেছেন; কিন্তু তাঁদের রচনা প্রধানত দ্বৈতীয়িক উৎস (secondary source) নির্ভর। বিশেষ কোনো গ্রামে ক্ষেত্রানুসন্ধান ও অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তারা বক্ষ্যমাণ বিষয়ে কোনো আলোচনা করেননি। এ কারণে বর্তমান অভিসন্দর্ভে তাদের আলোচনা সম্পর্কে কোনো পর্যবেক্ষণ বা মন্তব্য উপস্থাপিত হয় নি।

Dhaka University Institutional Repository

পরিধি ও রূপরেখা

বর্তমান অভিসন্দর্ভে আমরা চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানাধীন কদলপুর গ্রামের জাতিবর্ণ ব্যবস্থার উপর আলোকপাত করার প্রয়াস পেয়েছি। উক্ত গ্রামের জাতিবর্ণ ব্যবস্থা সম্পর্কেই আমরা আমাদের বিবেচনা সীমাবদ্ধ রেখেছি। একটি সুনির্দিষ্ট রূপরেখার আলোকে আমরা আলোচনায় অগ্রসর হয়েছি। 'অবতরণিকা' শীর্ষক প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার প্রস্তাবনা, গুরুত্ব, পদ্ধতি, পূর্ববর্তী গবেষকদের গবেষণা-পর্যালোচনা ইত্যাদি প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। মূল গবেষণায় অনুপ্রবেশের প্রাথমিক পদ্ধতি হিসেবে এ আলোচনা আমাদের কাছে জরুরি বলে বিবেচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম 'ভারতীয় জাতিবর্ণ ব্যবস্থা : একটি পর্যালোচনা'। এ অধ্যায়ে গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণের উদ্দেশ্যে ভারতীয় জাতিবর্ণ ব্যবস্থার উদ্ভব, বিকাশ ও বর্তমান অবস্থা, সামাজিক স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থার গুরুত্ব ইত্যাদি প্রসঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে। জাতিবর্ণ ব্যবস্থার স্বরূপ ও চারিত্র্য সম্পর্কিত এই অধ্যায় গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য অনুধাবনে সহায়ক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

'কদলপুর গ্রামের আর্থ-সামাজিক-ভৌগোলিক পরিচিতি' শীর্ষক তৃতীয় অধ্যায়ে গবেষণা এলাকা কদলপুর গ্রামের সামগ্রিক পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। কদলপুর গ্রামের ভৌগোলিক অবস্থান, জনসংখ্যা, হিন্দু-মুসলিম ও বৌদ্ধ সমাজ, অধিবাসীদের বাসগৃহ, পেশা, ধর্মাচরণ ইত্যাদি বিষয় এ অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ই বর্তমান অভিসন্দর্ভের মূল এলাকা। 'কদলপুর গ্রামের জাতিবর্ণ ব্যবস্থা' শীর্ষক এই অধ্যায়ে কদলপুর গ্রামের জাতিবর্ণ ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত পর্যবেক্ষণ তুলে ধরা হয়েছে। তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করে বিন্যস্ত হয়েছে মূল আলোচনা। পরিচ্ছেদত্রয় এরকম—(১) হিন্দু সমাজে জাতিবর্ণ ব্যবস্থা, (২) মুসলিম সমাজের সামাজিক স্তরবিন্যাস ও জাতিবর্ণ ব্যবস্থার প্রভাব, এবং (৩) জাতিবর্ণ ব্যবস্থার পরিবর্তন-প্রবণতা। এ অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে কদলপুর গ্রামের হিন্দু সমাজে বর্তমানে প্রচলিত প্রথাগত বর্ণ ব্যবস্থার বিদ্যমান প্রবণতাগুলো, যা অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে লাভ করা গেছে, উপস্থাপিত হয়েছে। জন্ম, বিয়ে, মৃত্যু,

Dhaka University Institutional Repository

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, ধর্মীয় বিধি-বিধান, লোকাচার, পেশা ইত্যাদি প্রসঙ্গই ছিল আমাদের পর্যবেক্ষণের প্রধান প্রধান দিক। হিন্দু সমাজের চতুর্বর্ণ ব্যবস্থা মুসলিম সমাজকেও নানাভাবে প্রভাবিত করে, ফলে সেখানেও এক ধরনের অদৃশ্য জাতিবর্ণ ব্যবস্থার অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। এ বিষয়টি বর্তমান অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তুলে ধরা হয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে আছে জাতিবর্ণ ব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা এবং পরিবর্তনশীলতা প্রসঙ্গ। 'উপসংহার' অংশে সন্নিবেশিত হয়েছে সমগ্র আলোচনার সারাৎসার।

তথ্যনির্দেশ

১. Anwarullah Chowdhury, *A Bangladesh Village : A Study of Social Stratification* (Dhaka : Center for Social Studies, 1978), p. 12

২. Bronislaw Malinowski, *Argonauts of the Western Pacific* (London : Routledge & Kegan Paul, 1922; Reprinted in 1978), p.18

৩. A. K. Nazmul Karim, *The Methodology for a Sociology of East Pakistan"* in Pierre Bessaignet (ed), *Social Research in East Pakistan* (Dacca : Asiatic Society of Pakistan, 1960), p. 6

৪. রামকৃষ্ণ মুখার্জী, *বাংলার ছ'টি গ্রাম* (ঢাকা : জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট, ১৯৯৭), পৃ. মুখবন্ধ-১৫

৫. Andre Beteille, "The Tribulations of Fieldwork", *Economic and Political Weekly* (Delhi, 1969), Nos. 31-33, Special Number, pp. 1509-1516

৬. Andre Beteille, Caste, *Class and Power : Changing Patterns of Stratification in a Tanjore Village* (New Delhi : Oxford University Press, 1996), p. 1

৭. Anwarullah Chowdhury, ibid, note No. 1, p.10

৮. Andre Beteille, ibid., note No. 6, p. 7

৯. Ibid, p. 80

১০. Ibid, p. 83

Dhaka University Institutional Repository

১১. Louis Dumont, *Homo Hierarchicus : The Caste System and Its Implications* (Delhi : Oxford University Press, 1998), p. 34

১২. বিস্তৃত বিবরণের জন্য দেখুন—G. S. Ghurye, *Caste and Race in India* (Bombay : Popular Prakashan, 1996), pp. 2-21

১৩. G. S. Ghurye, ibid, p. 47

১৪. M. N. Srinivas, *Village, Caste, Gender and Method* (Delhi : Oxford University Press, 1996), p. 57

১৫. Ibid, p. 58

১৬. H. H. Risley, *The Peoples of India* (London : W. Thacker Co., 1908), pp. 116-121

১৭. এ প্রসঙ্গে Satadal Das-Gupta-র *Caste Kinship and Community* (Hyderabad : University Press (India) Limited, 1993) গ্রন্থটি দেখা যেতে পারে।

১৮. Satadal Das-Gupta, ibid, p. xi

১৯. Anwarullah Chowdhury, ibid, note No. 1, p. 96

২০. Anwarullah Chowdhury, ibid, p. 97

২১. Anwarullah Chowdhury, ibid, p. 82

২২. A. F. Imam Ali, *Hindu-Muslim Community in Bangladesh* (Delhi : Kanishka Publishing House, 1992), p. 77

২৩. A. F. Imam Ali, ibid, p. 172

২৪. A. K. Nazmul Karim, *Changing Society in India, Pakistan and Bangladesh* (Dhaka : Nawroze Kitabistan, Fourth impression, 1996), pp. 201-02

২৫. A. K. Nazmul Karim, Ibid, p. 102.

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতীয় জাতিবর্ণ ব্যবস্থা : একটি পর্যালোচনা

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতীয় জাতিবর্ণ ব্যবস্থা : একটি পর্যালোচনা

জাতিবর্ণ ব্যবস্থা ভারতীয় সমাজকাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে নৃবিজ্ঞানীদের কাছে স্বীকৃত। জাতিবর্ণের দৃঢ় বন্ধন ভারতীয় সমাজে নিয়ে এসেছে শান্তি, সংহতি ও শৃঙ্খলা ; আবার একই সঙ্গে এই ব্যবস্থার ফলে সৃষ্টি হয়েছে সামাজিক দ্বন্দ্ব ও নানামাত্রিক অসমতা। কেবল ভারতীয় সমাজ-নৃবিজ্ঞানীরাই নন, পাশ্চাত্যেরও বহু সামাজিক-নৃবিজ্ঞানী জাতিবর্ণ ব্যবস্থা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা ও মন্তব্য করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, সমাজবিজ্ঞানের জনক অগাস্ট কোঁতে (১৭৯৮-১৮৫৭) ভারতীয় জাতিবর্ণ ব্যবস্থাকে সামাজিক সংহতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিসেবে মন্তব্য করেছেন। কোঁতের এই মন্তব্য ডন মার্টিনডেল লিখেছেন এইভাবে—"Comte had great admiration for the Indian caste system, which seemed to him a paradigm of social stability."[১] ভারতীয় জাতিবর্ণ ব্যবস্থার সামাজিক-নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনার জন্য এ ব্যবস্থার উদ্ভব ও বিকাশের দিকে আলোকপাত করা জরুরি বলে বিবেচনা করি।

ভারতীয় জাতিবর্ণ ব্যবস্থা বা Caste system সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে Caste শব্দটির দিকে দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। সমাজ-ইতিহাসকাররা এই মত ব্যক্ত করেছেন যে, ভারতীয় হিন্দুদের সামাজিক স্তরবিন্যাসের বিভাজন বোঝানোর জন্য 'জাতি' (caste) শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করে পর্তুগীজরা। স্প্যানিশ ও পর্তুগীজ ভাষায় 'কাস্টা' (casta) শব্দটি জাতি বা কুল (race, lineage, breed) অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই casta শব্দ থেকেই caste শব্দটির উদ্ভব হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[২] অন্যদিকে ল্যাটিন castus (অর্থ পবিত্র বা pure) থেকে ইংরেজি caste শব্দের উদ্ভব বলেও বলা হয়েছে।[৩] *The Oxford English Dictionary*-তে caste-এর ভিন্ন এক অর্থের কথাও বলা হয়েছে। Caste-কে আখ্যায়িত করা হয়েছে pure, unpolluted or unmixed stock or breed হিসেবে—অর্থাৎ বিশুদ্ধ, অকলুষিত কিংবা অবিমিশ্র কোন মানবগোষ্ঠীই হচ্ছে caste বা জাতি। তবে এ সূত্রে একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, জাতিবর্ণের ফলেই সমাজে দেখা দিয়েছে অবিশুদ্ধতা এবং অপবিত্রতার ধারণা।

Dhaka University Institutional Repository

ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজ পরিব্রাজকেরা ভারতীয় সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ একক হিসেবে স্বীকৃত বংশভিত্তিক বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীকে বোঝাতে caste (বা জাতি) শব্দটি ব্যবহার করেন। সমাজ-নৃবিজ্ঞানীরা নানাভাবে caste system-এর সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এই ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের জন্য কয়েকটি সংজ্ঞা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। সমাজবিজ্ঞানী Vidyabhushan এবং D. R. Sachdeva 'caste'-এর সংজ্ঞার্থ দিতে গিয়ে লিখেছেন—

> The word 'Caste' owes it's origin to the Spanish word 'Casta' which means 'breed, race, strain or a complex of hereditary qualities'. The Portuguese applied this term to the classes of people in India known by the name of 'jati'.[৪]

বংশানুক্রমিক পরিচয়ই জাতিবর্ণ ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই দিকে লক্ষ রেখে বিখ্যাত নৃবিজ্ঞানী Andre Beteille caste-এর সংজ্ঞার্থ দিয়েছেন এভাবে—"Caste may be defined as a small and named group of persons characterised by endogamy, hereditary membership, and a specific style of life which sometimes includes the pursuit by tradition of a particular occupation and is usually associated with a more or less distinct ritual status in a hierarchical system."[৫] বিখ্যাত ভারতীয় নৃবিজ্ঞানী M. N. Srinivas-এর মতানুসারে জাতিপ্রথা হল এক বিশেষ সর্বভারতীয় ব্যবস্থা, যেখানে সকলেরই সামাজিক অবস্থান জন্মসূত্রে নির্ধারিত। পেশা ও উৎপাদিত পণ্য caste system-এর বিশেষ পরিচয় বলে মনে করেন শ্রীনিবাস। তাঁর মতে—"A crucial feature of caste is its intimate linkage with production. Or rather, the process of production in traditional India cannot be disentangled from the caste system as it operates at the village (or other local) level."[৬] জাতি হচ্ছে একটি বদ্ধ গোষ্ঠী, যেখানে বংশানুক্রমিক ভাবেই সবকিছু নির্ধারিত হয়ে থাকে। আন্তর্বৈবাহিক এই গোষ্ঠীর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে এই বৈশিষ্ট্যের দিকেই গুরুত্ব দিয়েছেন নৃবিজ্ঞানী Colley। তিনি লিখেছেন—"When a class is somewhat strictly hereditary, we may call it a caste."[৭]

Dhaka University Institutional Repository

ভারতীয় নৃবিজ্ঞানীদের মতো পাশ্চাত্যের বহু সমাজ-নৃবিজ্ঞানী caste-এর সংজ্ঞা ও স্বরূপ ব্যাখ্যায় প্রয়াস পেয়েছেন। R. M. MacIver caste-এর সংজ্ঞার্থ দিতে গিয়ে লিখেছেন— "When status is wholly predetermined, so that men are born to their lot without any hope of changing it, then class takes the extreme form of caste."[৮] সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধারণায় ভারতীয় জাতিবর্ণ ব্যবস্থাকে অনন্য (unique) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন বিশ্বখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী T. B. Bottomore। তিনি লিখেছেন—

> The Indian caste system is unique among systems of social stratification ...The *jatis*, which developed later and which continued to grow in number through the extending division of labour, the incorporation of tribes, and to a lesser extent, the operation of factors such as religious innovation, are the basic units of the traditional caste system.[৯]

ভারতীয় জাতিবর্ণ ব্যবস্থায় জন্মসূত্রই সামাজিক মর্যাদার ক্রমোচ্চ বিভাজন নির্ধারণ করে দেয়। বংশ-পরিচয়গত স্তরায়ণ অতিক্রম করা ভারতীয় জাতিবর্ণে সম্ভব নয় বললেই চলে। এ প্রসঙ্গে Anderson এবং Parkar-এর অভিমত উল্লেখ করা যায়। জাতিবর্ণের সঙ্গে জন্ম-সূত্রের কথা বলতে গিয়ে তাঁরা লিখেছেন—"Caste is that extreme form of social class organization in which the position of individuals is the status hierarchy is determined by descent and birth."[১০] প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় G. A. Lundberg-এর মন্তব্য। *Foundations of Sociology* শীর্ষক গ্রন্থে Lundberg লিখেছেন—"A caste is merely a rigid social class into which members are born and form which they can withdraw or escape only with extreme difficulty."[১১] জাতিবর্ণই যে সামাজিক স্তরায়ণের একমাত্র ভিত্তি, সে-কথা Arnold Green-এর মন্তব্যেও ধরা পড়ে। Green লিখেছেন—"Caste is a system of stratification in which mobility, up and down the status ladder, at least ideally may not occur."[১২]

Dhaka University Institutional Repository

ভারতীয় জাতিবর্ণ সম্পর্কে পাশ্চাত্যে যে-সব নৃবিজ্ঞানী গবেষণা করেছেন, তাঁদের মধ্যে Louis Dumont-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। Dumont-এর মতে ভারতীয় জাতিবর্ণে তিনিটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়ত্রয় হচ্ছে—বিয়ে, শ্রমবিভাগ এবং বংশানুক্রম। তিনি লিখেছেন—

> ...the caste system divides the whole society into a large number of hereditary groups, distinguished from one another and connected together by three characteristics : separation in matters of marriage and contact, whether direct or indirect (food); division of labour, each group having, in theory or by tradition, a profession from which their members can depart only within certain limits ; and finally hierarchy, which ranks the groups as relatively superior or inferior to one another.[১৩]

ভারতীয় সনাতন জাতিবর্ণ ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হচ্ছে বর্ণাশ্রম প্রথা, যা চতুর্বর্ণ প্রথা নামে সমধিক পরিচিত।[১৪] সনাতন হিন্দুসমাজ চারটি শ্রেণী বা বর্ণে বিভক্ত ছিল। এই বর্ণগুলো হচ্ছে—ব্রাহ্মণ বর্ণ, ক্ষত্রিয় বর্ণ, বৈশ্য বর্ণ এবং শূদ্র বর্ণ। চারবর্ণের বাইরে যারা তাদেরকে বলা হয় Scheduled Caste—untouchables বা নমঃশূদ্র। যে প্রথার মাধ্যমে বর্ণগুলোর মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণীত হতো, তারই নাম বর্ণাশ্রম প্রথা। বর্ণাশ্রম প্রথা অনুযায়ী প্রতিটি মানুষ বংশানুক্রমিকভাবে সুনির্দিষ্ট পেশার সঙ্গে জড়িত থাকতো এবং সামাজিক মর্যাদা ও স্তরায়ণের ক্ষেত্রে উচ্চতা-নীচতার অনুক্রম দৃঢ়ভাবে মেনে চলতো।[১৫] গুণ ও কর্ম অনুসারে সনাতন হিন্দু সমাজের বর্ণবিভাগ করা হয়েছে বলে *রামায়ণ*-এ উল্লেখ আছে। *রামায়ণ*-এর ১ : ১ : ৭৯ নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে—"চাতুর্ব্বর্ণ্য লোকস্মিন স্বে স্বে ধর্ম্মে নিয়কস্যতি।" *শ্রীমদ্ভগবদগীতা*-য়ও অনুরূপ কথা ব্যক্ত হয়েছে। অর্জুনকে উদ্দেশ্য করে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

> চাতুর্বর্ণ্য ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।
> তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্ ॥
> (বঙ্গানুবাদ : গুণ কর্ম অনুসারে বর্ণ চতুষ্টয়। / সৃজিয়াছি, জেনো মোরে অকর্তা অব্যয় ॥)[১৬]

—এই সূত্র থেকে এমন ধারণা সৃষ্টি হতে পারে যে, সত্য, সহৃদয়তা, দান, ক্ষমা, তপস্যা, দয়া প্রভৃতি গুণ অর্জন করলে যে কেউ ব্রাহ্মণ হতে পারে। কিন্তু বাস্তবে তা

Dhaka University Institutional Repository

সম্ভব ছিল না। পুরাণের কোনো কোনো গল্পে এমন দৃষ্টান্ত থাকলেও, বিশেষ বর্ণভুক্ত একজন মানুষ কোনো ক্রমেই জন্মসূত্রে প্রাপ্ত বর্ণ পরিবর্তন করতে পারে না। এ প্রসঙ্গে মহাভারত-এর কাহিনী উল্লেখ করে বিনয় ঘোষ লিখেছেন—"সর্পরূপী নহুষের প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেছিলেন—'সত্য সহৃদয়তা দান ক্ষমা তপস্যা দয়া যে ব্যক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় তিনি ব্রাহ্মণ।' নহুষ বলেন—'এসব গুণ তো শূদ্রদের মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায়।' যুধিষ্ঠির উত্তরে বলেন—'শূদ্রের জাতিগত গুণ (পরিচর্যাদি) যদি ব্রাহ্মণে দেখা যায়, তাহলে তাকে শূদ্র মনে করব। আর ব্রাহ্মণের গুণ শম দম ইত্যাদি যদি শূদ্রে দেখা যায় তাহলে তাকে ব্রাহ্মণ মনে করব।' যুধিষ্ঠির সজ্ঞানে এখানে মিথ্যা কথা বলে নহুষকে ধাপ্পা দিয়েছিলেন। তাছাড়া যুধিষ্ঠির ধর্মপুত্র হলেও তিনি যদি কর্মগুণে ব্রাহ্মণ বা শূদ্র মনে করেন, তাতে ব্রাহ্মণের বা শূদ্রের বা সমাজের কিছু আসে যায় না।"[১৭] বৃন্দাবন দাসের *চৈতন্যভাগবত* শীর্ষক গ্রন্থেও অনুরূপ মন্তব্য পাওয়া যায়। ওই গ্রন্থে বৃন্দাবন দাস লিখেছেন—"চণ্ডাল চণ্ডাল নহে কৃষ্ণ যদি বোলে।/ বিপ্র নহে বিপ্র যদি অসৎ পথে চলে॥"[১৮] এ শ্লোক থেকে ধারণা করা যায়, বিশেষ বর্ণভুক্ত মানুষ অন্য বর্ণে স্থানান্তরিত হতে পারে, যদিও বাস্তবে এমনটা হওয়া প্রাচীন ভারতে কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না।

হিন্দুধর্মের অন্যতম দার্শনিক ভিত্তি ঋগ্বেদ-এ সনাতন চতুর্বর্ণ ব্যবস্থা সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক Romila Thapar মনে করেন, খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতকের দিকে ঋগ্বেদ রচিত হয়।[১৯] হিন্দুসমাজ বলতে যা বোঝায়, ওই সময়ে প্রকৃত অর্থে তা গড়ে ওঠেনি; তবু ঋগ্বেদকেই হিন্দুধর্মের প্রাচীনতম শাস্ত্রগ্রন্থ হিসেবে গণ্য করা হয়। ঋগ্বেদ-এর দশম মণ্ডলের একটি শ্লোকে সর্বপ্রথম বর্ণবিভাগের উল্লেখ পাওয়া যায়। ওই শ্লোকে বলা হয়েছে—

> ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্য কৃতঃ।
> উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥[২০]
>
> (বঙ্গানুবাদ : ব্রাহ্মণের জন্ম [পরম] পুরুষের মুখ থেকে, ক্ষত্রিয়ের জন্ম বাহু থেকে, বৈশ্যের জন্ম উরু থেকে, এবং শূদ্রের জন্ম চরণ থেকে।)

ঋগ্বেদ-এ বর্ণসমূহের জন্মস্থানের যে আনুক্রমিক বর্ণনা আছে, তা বর্ণ চতুষ্টয়ের উল্লম্ব (vertical) অবস্থান সম্পর্কে এক ধরনের ধারণা সৃষ্টি করে। সেখানে সবার উপরে

Dhaka University Institutional Repository

ব্রাহ্মণ, তার নীচে ক্ষত্রিয়, তার নীচে বৈশ্য, এবং সবার নীচে শূদ্র। উচ্চ-নীচের এই ধারণা ক্রমে কোনো বর্ণকে শ্রেষ্ঠ এবং কোনো বর্ণকে নিকৃষ্ট ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে। কালক্রমে চার বর্ণের নারী-পুরুষের পারস্পরিক মিলনে জন্ম নেয় অনেক সংকর বর্ণ।[২১]

বিখ্যাত নৃবিজ্ঞানী G. S. Ghurye তাঁর *Caste and Race in India* গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, ঋগ্বেদ-এর অধিকাংশ স্থানে তিনটি শ্রেণীর উল্লেখ রয়েছে। এই শ্রেণীত্রয় হচ্ছে—Brahma, Kshatra, এবং Visha। Ghurye-র ভাষায়—"In the *Rigveda*, the earliest work of the first period three classes of society are very frequently mentioned, and named Brahma, Kshatra, and Visha. The first two represented broadly the two professions of the poet-priest and the warrior-chief. The third division was apparently a group comprising all the common people."[২২]

Ghurye ঋগ্বেদ-এর *Purushasukta* খণ্ডের একটি শ্লোক বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, সেকালে বাংলাদেশে চার ধরনের সামাজিক বিভাজন ক্রিয়াশীল ছিল। এই চার ধরনের সামাজিক বিভাজন ছিল এরকম—Brahmana, Rajanya, Vaishya, and Shudra। Ghurye লিখেছেন—"It is only in one of the later hymns, the celebrated *Purushasukta*, that a reference has been made to four orders of society as emanating from the sacrifice of the Primeval Being. The names of those four orders are given there as Brahmana, Rajanya, Vaishya, and Shudra, who are said to have come respectively from the mouth, the arms, the things, and the feet of the Creator. The particular limbs associated with these divisions and the order in which they are mentioned probably indicate their status in the society of the time, though no such interpretation is directly given in the hymn."[২৩] তৈত্তিরীয় সংহিতা-য় পরম পুরুষের চার অঙ্গ থেকে উদ্ভূত চারটি বর্ণের সামাজিক মর্যাদা ও বর্ণগত অবস্থান প্রসঙ্গে যা বলা হয়েছে, Ghurye তা উপস্থাপন করেছেন এভাবে—

> The *Taittiriya Samhita*, for example, ascribes the origins of those four classes to the four limbs of the Creator and adds an explanation. The Brahmins are declared to be the chief because

Dhaka University Institutional Repository

they were created from the mouth, punning on the word 'Mukha' ('mouth' and 'chief'). The Rajanyas are vigorous because they were created from vigour. The Vaishyas are meant to be eaten, referring to their liability to excessive taxation, because they were created from the stomach, the receptacle of food. The Shudra, because he was created from the feet, is to be the transporter of others and to subsist by the feet.[২৮]

ঋগ্বেদ-এর দশম মণ্ডলের ভাষ্যের সঙ্গে Ghurye-র ব্যাখ্যায় সামান্য পার্থক্য থাকলেও, উভয় স্থানেই চতুর্বর্ণ ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য অভিন্ন। শাস্ত্রীর ব্যাখ্যা অনুসারে গুণ ও কর্মের (বৃত্তির) বিভাগের ভিত্তিতে হিন্দুসমাজের জাতিবর্ণ ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে। প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার, চতুর্বর্ণ সৃষ্টির ব্যাপারে হিন্দুধর্মের সকল শাস্ত্রগ্রন্থে একই কথা বলা হয়নি। বৃহদারণ্যক উপনিষদ, মহাভারত ইত্যাদি ধর্মশাস্ত্রে এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত পাওয়া যায়। কোনো কোনো সমাজ-ইতিহাসকার মনে করেন—আর্য ও অনার্যের মধ্যে বিভেদ-সংঘাতের ফলস্বরূপ সৃষ্টি হয়েছে শূদ্র বর্ণের।[২৯]

জাতিবর্ণ-বিষয়ক আলোচনায় M. N. Srinivas 'কর্মের ধারণা' ও 'ধর্মের ধারণা' প্রত্যয়দ্বয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কর্মফল অনুযায়ী একজন হিন্দু বিশেষ কোনো বর্ণে জন্মগ্রহণ করে থাকে। এটাই হলো কর্মের ধারণা। ধর্মের ধারণা অনুযায়ী জাত-পাতের কতগুলো কৃত্য বা নিয়মাবলির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। জাতিবর্ণের ক্ষেত্রে ধর্মের ধারণা সামাজিক স্তর-বিভাজনকে অধিকতর শক্তিশালী করে। শ্রীনিবাস মনে করেন, জাত-পাতের মূলে পবিত্রতা এবং অপবিত্রতার ধারণাও অতীতে ক্রিয়াশীল ছিল। J. H. Hutton তাঁর *Caste in India* গ্রন্থে অনুরূপ মন্তব্য করেন।[৩০] Hutton-এর আলোচনার সূত্র ধরে অভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন প্রখ্যাত সমাজ-ইতিহাসকার ইরফান হাবিব। *ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গ* শীর্ষক গ্রন্থে হাবিব লিখেছেন—

বর্ণ হলো এক সুস্পষ্টভাবে সুচিহ্নিত ও পৃথকীভূত গোষ্ঠী যার সদস্যরা পরস্পরের সাথে অন্তর্বিবাহসূত্রে (এবং পুরুষের ক্ষেত্রে বহির্বিবাহ) এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটি সাধারণ বংশানুক্রমিক, প্রকৃত অথবা প্রস্তাবিত পেশা

Dhaka University Institutional Repository

অথবা কর্তব্যের বন্ধনে পরস্পরের সাথে যুক্ত। অবশ্য অনেক সমাজতত্ত্ববিদ এই সংজ্ঞা যথেষ্ট পর্যাপ্ত নয় বলে মনে করেন। তাঁরা সংযুক্ত করেন যে, অন্য বর্ণের প্রতিতুলনায় কোনো একটি বর্ণের মর্যাদাসংক্রান্ত ধারণার অস্তিত্বকেও অন্যতম শর্ত হিসাবে আমাদের গণ্য করতে হবে— একটি বর্ণের নিজস্বতার নিরিখে অন্য বর্ণসমূহের 'বিশুদ্ধতা' এবং 'অবিশুদ্ধতা'-র মাত্রায় এবং প্রতিটি বর্ণের একান্ত আপনার কিছু বিশিষ্ট রীতি-রেওয়াজ ও অভ্যাস অথবা নির্দিষ্ট আরোপিত জীবনযাপনের মধ্যেই এই মর্যাদার স্তরটি আপনাকে প্রকাশের পথসন্ধান করে।[২৭]

শ্রীনিবাস কিংবা হাবিবের মতো T. B. Bottomore-ও ভারতীয় জাতিবর্ণ ব্যবস্থায় কর্মফল ও ধর্মের ধারণাকে প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে শনাক্ত করেছেন। কর্ম এবং ধর্মের ধারণা থেকেই জাতিবর্ণ ব্যবস্থায় বর্ণসমূহের মাঝে শাস্ত্রীয় পবিত্রতা এবং অপবিত্রতার ধারণার সৃষ্টি হয়েছে বলে বটোমোর মত প্রকাশ করেছেন। K. M. Panikkar-এর[২৮] মত উল্লেখ করে বটোমোর লিখেছেন, কর্ম ও ধর্মের ধারণা থেকেই হিন্দুধর্মের অধিকাংশ বিধি-বিধান সৃষ্টি হয়েছে। হিন্দুসমাজের ঐতিহ্যিক আইনসমূহ ধর্মচিন্তা দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত ছিল। হিন্দুসমাজে কর্ম ও ধর্মের ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বটোমোর লিখেছেন—

> The notions of *karma*, *dharma*, and pollution have figured prominently in both religious and legal thought, and together they constitute a doctrine which is undoubtedly one of the principal sustaining forces of the caste system.[২৯]

সামাজিক স্তরবিন্যাসের যতগুলো মাপকাঠি আছে, তার মধ্যে জাতিবর্ণ ব্যবস্থাকে বটোমোর অনন্য (unique) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। শ্রীনিবাসের মত সমর্থন করে বটোমোরও শাস্ত্রীয় পবিত্রতা ও অপবিত্রতার ধারণাকেই বর্ণপ্রথার প্রধান ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করেছেন। বটোমোর লিখেছেন—"The concept of pollution... is fundamental to the caste system and every type of caste relation is governed by it.[৩০] শাস্ত্রীয় পবিত্রতা-অপবিত্রতার ধারণার পাশাপাশি কর্মের ধারণাও গুরুত্বের সঙ্গে ব্যাখ্যাত হয়েছে বটোমোরের রচনায়। তাঁর মতে, কর্মের কারণেই

Dhaka University Institutional Repository

একজন ব্যক্তি সুনির্দিষ্ট একটি বর্ণে বা জাতিতে জন্মগ্রহণ করে। বটোমোরের ভাষায়—"...the notions of *karma*, which teaches a Hindu that he is born in a particular sub-caste because he deserved to be born there... ."[৩১]

বর্ণপ্রথা হিন্দুধর্মের একটি অতি-প্রাচীন এবং অনিবার্য প্রতিষ্ঠান (Institution)। বলার অপেক্ষা রাখেন না যে, বর্ণপ্রথায় এক বর্ণের মানুষের সঙ্গে অন্য বর্ণের মানুষের সম্পর্ক নির্ধারিত হয় জাতিবর্ণের কঠোর বিধান অনুসারে। এই সম্পর্ক সর্বদাই ক্রম-উচ্চতাধর্মী। এ প্রসঙ্গে নৃবিজ্ঞানী Veena Das জানাচ্ছেন—"In sociological literature on Hinduism, authors such as Weber (Garth & Mills, 1948 : 396 and Srinibas (1952 : 12) have assumed that (i) caste is the fundamental institution of Hinduism, and (ii) relations between castes are essentially hierarchical."[৩২]

ভারতবর্ষে বর্ণ-কাঠামোতে ব্রাহ্মণরা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। বহিরাগত এই গোষ্ঠী বাংলার সমাজকাঠামোতে, বর্ণ ব্যবস্থার সুবাদে অভিভাবকত্বের মর্যাদায় উন্নীত হয়। ডি. ডি. কোসাম্বী মনে করেন, কৃষিব্যবস্থা থেকে সর্বত্র ব্রাহ্মণরা বর্ণশক্তিতে নিজেদের আধিপত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করে।[৩৩] বর্ণ ব্যবস্থায় তিনি লক্ষ করেছেন সামাজিক শোষণের নানাবিধ ক্রম। ইরফান হাবিবও ব্যক্ত করেছেন অভিন্ন অভিমত। হাবিব লিখেছেন—"বর্ণ কাঠামোর যে খণ্ডটি পরিবর্তনের পক্ষে সদা উন্মুখ ছিলো সেটি হলো শাসক এবং যোদ্ধৃ শ্রেণী—ক্ষত্রিয়রা (রাজন্যবর্গ)। বহিরাক্রমণ এবং বিদ্রোহে সশস্ত্র ক্ষমতার বংশানুক্রমিক একচ্ছত্র অধিকার চূড়ান্ত রকমে কঠিন হয়ে পড়লো যার সরল সাক্ষ্য বহন করে চলেছে পুরাণ। এইভাবে, যৌক্তিক বিচারে, বর্ণব্যবস্থা যেখানে সবচেয়ে শক্তিশালী হতে পারতো সেইখানেই, যথা শাসকগোষ্ঠীর স্থায়ীত্বের প্রশ্নে প্রকৃত অর্থে সেটি সবচেয়ে দুর্বল ছিলো। অতএব, সমগ্র বর্ণ-কাঠামোয় এমন একটি শোষণ ব্যবস্থার আভাস পাওয়া গেলো, একেবারে নিজস্ব শর্তেই যার প্রধান সুবিধাভোগী হলো ক্ষমতার অবৈধ দখলকারী অথবা বহিরাগতরা।"[৩৪] কৌটিল্যও তাঁর অর্থশাস্ত্র-এ বর্ণব্যবস্থায় ব্রাহ্মণদের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছেন।

কোসাম্বী মনে করেন পুরাণকথিত প্রক্রিয়ায় বর্ণ ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেনি, বরং এর উদ্ভবের পশ্চাতে আছে সামাজিক শ্রম-বিভাজন নীতি। *An Introduction to the Study of*

Dhaka University Institutional Repository

Indian History গ্রন্থে কোসাম্বী এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, মূল বৈদিক সমাজের অন্তর্গত বর্ণ-বিভাজন থেকে নয়, বরং সামগ্রিকভাবে একটি বহিস্থ প্রক্রিয়া থেকেই এই বর্ণগুলি উদ্ভূত।[৩৫] সমাজ-ইতিহাসকাররা বহিস্থ প্রক্রিয়া বলতে মূলত শ্রম-বিভাজনের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। ইরফান হাবিবও মনে করেন, বর্ণ-ব্যবস্থা আপেক্ষিকভাবে শ্রম-বিভাজনেরই একটি দৃঢ় রূপ, এবং তা উৎপাদন-সম্পর্কের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক।[৩৬] ম্যাক্স ওয়েবার (১৮৬৪-১৯২০) ভারতবর্ষের বর্ণ-নির্ধারিত অপরিবর্তনীয় শ্রমকে 'ঐশ্বরিক শ্রম' বলে অভিহিত করেছেন।[৩৭] কিন্তু William Henricks Wiser[৩৮] কিংবা Louis Dumontসহ[৩৯] প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের কোনো সমাজ-নৃবিজ্ঞানীই ওয়েবারের এই মন্তব্য মেনে নেননি। ঐশ্বরিক শ্রমের ধারণার পরিবর্তে এ ব্যবস্থাকে তাঁরা শোষণের কৌশল হিসেবেই বিবেচনা করেছেন। তাঁদের মতে, প্রকৃত ব্যবস্থাটি মোটেই ঐশ্বরিক শ্রম নয়, এটি 'যজমানী' ব্যবস্থা; অর্থাৎ এটি এমন এক ব্যবস্থা যেখানে কারিগররা কেবল কয়েকটি নির্দিষ্ট পরিবারের সেবা করে।[৪০] গবেষক মনোহর বিশ্বাস মন্তব্য করেছেন শ্রম-বিভাজনের তত্ত্বটি আসলে সামাজিক শোষণের চতুর কৌশলের পরাকাষ্ঠা। মনুসংহিতা-য় বর্ণভেদের তত্ত্ব আছে বলে তিনি ওই গ্রন্থ সম্পর্কে লিখেছেন—

> সেকালের 'মনুসংহিতা'য় জাতিভেদ-বিষয়ক শ্লোকগুলি মানবহিতকর কোনো ধর্ম কি? না, অধর্ম? না প্রভুত্ব ও প্রতাপ নিরঙ্কুশ রাখার রক্ষাকবচ? আর্যসমাজের এই গ্রন্থখানি অনাদিকালের বিতর্কিত। প্রভুত্বাত্ম মননে নির্মিত এক 'Historiography' চতুর কৌশলের পরাকাষ্ঠা।[৪১]

ব্রাহ্মণরা এই তত্ত্ব প্রচার করেছে যে, তাদের সেবা করার জন্যই অন্য বর্ণগুলোর উদ্ভব হয়েছে। নিম্ন-বর্ণের মানুষের পাপ মোচনের জন্য ব্রাহ্মণরা নানা কৃত্য পালন করে—একথাও তাদের বিশিষ্ট প্রচার। নিম্ন-বর্ণের মানুষেরাও এ তত্ত্ব গভীরভাবে বিশ্বাস করতো। ব্রাহ্মণরা এইকথা বলতো যে, নিম্ন-বর্ণের লোকেরা যেমন ব্রাহ্মণের সেবা করে, তেমনি ব্রাহ্মণরাও তাদের কল্যাণার্থে অনেক কৃত্য পালন করে থাকে। গবেষক Veena Das জানাচ্ছেন—

> The rules formulated for the kaliyuga, however, forbid Brahmans to perform sacrifices for the 'lower *Varnas*' The lower *Varnas*

Dhaka University Institutional Repository

> are enumerated as Washermen, Leather-workers, Dancers, Musicians, Fishermen and Bhilas. Here the expression 'lower *Varnas*' is clearly being used to denote certain *jatis* and from our knowledge of Indian ethnography we know that what these castes have in common (except for the Bhilas) is the polluting nature of their occupations. Thus it is clear that the Brahmans are being forbidden to render ritual services to pulluting castes.[৪৩]

ব্রাহ্মণরা নিজেদের পবিত্র ভাবতেন এবং এই পবিত্রতা রক্ষার জন্য তারা অন্য বর্ণের স্পর্শ থেকে দূরে থাকতেন। অন্য বর্ণের মানুষের কোনো খাবার ব্রাহ্মণরা গ্রহণ করেন না। বৃত্তিগত ভেদাভেদকে জাতিবর্ণের প্রধান ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করলেও উপর্যুক্ত বিবেচনায় Ghurye একটি স্বতন্ত্র মতের কথা ব্যক্ত করেছেন। *Class, Caste and Occupation* শীর্ষক গ্রন্থে Ghurye এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, ভারতবর্ষে উপস্থিত হবার পর আর্য পুরোহিতরা রক্তের বিশুদ্ধতা বজায় রাখার ব্যাপারে সচেতন হয় এবং এক্ষেত্রে কার্যকর কৌশল হিসেবে তারা সৃষ্টি করে জাতিভেদ প্রথা।[৪৩]

ব্রাহ্মণরা সমাজে পণ্ডিত হিসেবে পরিচিত। এঁরা বেদ-বাণী শোনায় এবং বিনিময়ে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের কাছ থেকে দান-দক্ষিণা লাভ করে। ক্ষত্রিয়রা শাসক এবং যোদ্ধা, তারা রাজশক্তির অধিকারী। রাষ্ট্রের বা বিশেষ কোনো অঞ্চলের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব তাদের উপর অর্পিত ছিলো। ক্ষত্রিয়রা শত্রুর মোকাবেলা করে, ব্রাহ্মণদের দান-দক্ষিণা দেয়, রক্ষা করে বৈশ্যদের। বৈশ্যরা যুক্ত থাকতো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে। বৈশ্যরা মূলত কৃষক এবং ব্যবসায়ী। তারা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের জন্য কৃষি উৎপাদন, পশুপালন এবং সীমিত পরিমাণে ব্যবসা-বাণিজ্য করতো। বৈশ্যরা নানা উৎস থেকে সংগৃহীত লভ্যাংশের একটা অংশ ক্ষত্রিয়দের খাজনা হিসেবে প্রদান করতো। কেননা, রাজশক্তির অধিকারী ক্ষত্রিয়রা শত্রুর হাত থেকে বৈশ্যদের রক্ষা করে। শূদ্ররা মূলত সেবক (servant)। এরা দ্বিজ বর্ণের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য দু'বার জন্ম নেয় বলে এদের বলা হয় দ্বিজ) মানুষের সেবাদান করে জীবিকা নির্বাহ করে।[৪৪]

মনুসংহিতা-র যুগ থেকেই বর্ণ-ব্যবস্থায় শূদ্রদের অবস্থা ছিল সবচেয়ে খারাপ। শূদ্রদের দুর্গতি ছিল চরম, অধিকার আর সামাজিক সম্মানে তারা ছিল বঞ্চিত। পশুবৎ

Dhaka University Institutional Repository

জীবনধারণে বাধ্য করা হয়েছিল তাদের। 'শূদ্র' নামকরণের মাঝেই উচ্চবর্ণের তিন শ্রেণীর প্রভুত্বের রূপটি প্রকটিত হয়েছে বলে প্রখ্যাত সমাজ-ইতিহাসকার রামশরণ শর্মা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি লিখেছেন—

> জানতে ইচ্ছা হয় চতুর্থ বর্ণকে শূদ্র বলা হতো কেন? মনে হয়, সাধারণভাবে ইউরোপে প্রচলিত শব্দ 'স্লেভ' ও সংস্কৃত 'দাস' যেমন বিজিত মানবগোষ্ঠীর নাম থেকে নেওয়া, তেমনি শূদ্র শব্দটিরও উৎপত্তি হয়েছে একটি বিজিত জনগোষ্ঠীর নাম থেকে। খৃ. পূ. চতুর্থ শতকে শূদ্র নামে যে একটি জনগোষ্ঠী ছিল তাতে কোন সন্দেহই নেই, কারণ দিওদোরস লিখেছেন যে আলেজান্ডার সোদ্রাই নামক এক জনগোষ্ঠীকে আক্রমণ করেছিলেন।[৪৫]

আর্যসমাজ থেকে বাংলার সমাজ-সংগঠন ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রাচীন বাংলার সামাজিক সংগঠন ছিল কৌমভিত্তিক। আবার ভিন্নার্থে বললে বাংলার সমাজ ছিল বিভিন্ন বৃত্তিধারী জাতিগোষ্ঠীর সমাজ। কৌমসমাজে জাতিবর্ণগুলো ছিল মূলত একটি পেশাগত গোষ্ঠী।[৪৬] কৌমসমাজে চতুর্বর্ণের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। পক্ষান্তরে আর্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত ছিল চতুর্বর্ণ ব্যবস্থার উপরে। এ কারণে আর্যরা বাংলার মানুষদের অবজ্ঞা ও ঘৃণার চোখে দেখতো। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় বিশিষ্ট সমাজ-ইতিহাসকার অতুল সুরের অভিমত—"আর্যসমাজ থেকে বাঙলার সমাজসংগঠন সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। আর্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত ছিল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চাতুর্বর্ণের উপর। সুতরাং বিদেহের পূর্বে অবস্থিত 'প্রাচ্য' দেশে চাতুর্বর্ণ সমাজের অনুপ্রবেশ ঘটেনি। সেখানে যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেটা হচ্ছে কৌমসমাজ—বিভিন্ন বৃত্তিধারী জাতিগোষ্ঠীর সমাজ। সে-সমাজের মধ্যে ছিল নানা বৃত্তিধারী মানুষ। কিন্তু তাদের মধ্যে চাতুর্বর্ণের বিভেদ ছিল না। এই চাতুর্বর্ণের বিভেদ না থাকার দরুনই আর্যরা প্রাচ্যদেশের লোকেদের ঘৃণার চোখে দেখত।"[৪৭]

ব্রাহ্মণদের সঙ্গে অন্যান্য বর্ণের সম্পর্কের সূত্রটিও ছিল প্রভু-দাস তত্ত্বশাসিত। উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণরা নানাভাবে শূদ্রদের শোষণ করতো। শাস্ত্রীয় পবিত্রতা-অপবিত্রতার কথা বলে ব্রাহ্মণরা শূদ্রদের অধঃস্তন করে রেখেছিল। ব্রাহ্মণদের সঙ্গে অন্যান্য বর্ণের সম্পর্কের মাত্রা নির্দেশ-সূত্রে গবেষক নীহাররঞ্জন রায়ের অভিমত এখানে স্মরণ করা যায়। তিনি

Dhaka University Institutional Repository

লিখেছেন—"রজক, কর্মকার, নট, বরুড়, কৈবর্ত, মেদ, ভিল্ল, চণ্ডাল, পুক্কশ, কাপালিক, নর্তক, তক্ষণ, সুবর্ণকার, শৌণ্ডিক এবং পতিত ও নিষিদ্ধ বৃত্তিজীবী ব্রাহ্মণদের দ্বারা স্পৃষ্ট বা পক্ব খাদ্য ব্রাহ্মণদের পক্ষে ভক্ষণ নিষিদ্ধ ছিল ; এই নিষেধ অমান্য করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। শূদ্রপক্ব অন্নভক্ষণও নিষিদ্ধ ছিল ; নিষেধ অমান্য করিলে পূর্ণ কৃচ্ছ্র-প্রায়শ্চিত্তের বিধান ছিল। ...ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়পক্ব অন্নগ্রহণ করিলে কৃচ্ছ্র-প্রায়শ্চিত্তের অর্ধেক পালন করিলেই চলিবে; আর বৈশ্যপক্ব অন্ন গ্রহণ করিলে তিন-চতুর্থাংশ। ক্ষত্রিয় যদি শূদ্রপক্ব অন্ন গ্রহণ করে তাহাকে পূর্ণ কৃচ্ছ্র-প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, কিন্তু বৈশ্যপক্ব অন্ন গ্রহণ করিলে অর্ধেক প্রায়শ্চিত্ত করিলেই চলিবে; বৈশ্য শূদ্রপক্ব অন্ন গ্রহণ করিলেও অর্ধেক প্রায়শ্চিত্তেই চলিতে পারে।"[৪৮] কাজেই দেখা যাচ্ছে, প্রায়শ্চিত্তের ক্ষেত্রেও বর্ণক্রমের মর্যাদা ও অবস্থানের গুরুত্ব ছিল প্রবল। বস্তুত, বর্ণচতুষ্টয়ের সম্পর্ক সামাজিক ক্রমোচ্চ ধারণার সমান্তরাল ছিল। গবেষক Veena Das জানাচ্ছেন—

> In explaining the *Varna* scheme of relations, it has been often assumed that the four *Varna* categories are homologous categories arranged in an hierarchical order. The hierarchy has not been conecived as linear. ...According to this mode of argument the *Varna* seheme first posits an opposition between Brahmans and others. Next, it posits sequentially the opposition between Brahmans and Kshatriyas, on the one hand, and the rest of the population, on the other ; the twice-born as opposed to the Shudra ; and finally the Arya opposed to the Dasyu.[৫১]

ভারতীয় বর্ণব্যবস্থাকে সমাজ-নৃবিজ্ঞানীরা সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক স্তরবিন্যাস বলে ব্যাখ্যা করেছেন।[৫০] তাঁদের মতে, বর্ণপ্রথার কারণেই ভারতবর্ষে ইউরোপের মতো দাস ও ভূমিদাস শ্রেণী সৃষ্টি হতে পারে নি। চরিত্রগত দিক থেকে ইউরোপের এস্টেটের সঙ্গে ভারতীয় জাতিবর্ণের অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী বংগলাল সেনের অভিমত এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়। তিনি লিখেছেন—"পুরোহিত, যোদ্ধা ও অভিজাত, ব্যবসায়ী ও ভূমিদাস শ্রেণীগুলো ইউরোপের সামন্তবাদী এস্টেট ও ভারতীয়

Dhaka University Institutional Repository

সামন্ততান্ত্রিক জাতিবর্ণ ব্যবস্থার মধ্যে প্রায় অভিন্নভাবে বিদ্যমান। তবে পাশ্চাত্যের সামন্তবাদ ও প্রাচ্য তথা ভারতবর্ষের সামন্তবাদের মধ্যে যেমন পার্থক্য রয়েছে, তেমনি মধ্যযুগীয় সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধরন হিসাবে এস্টেট ব্যবস্থার সাথে ভারতীয় জাতিবর্ণ ব্যবস্থার কতক অমিলও আছে। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের জাতিবর্ণ ব্যবস্থা হচ্ছে প্রাচীন গ্রীস ও রোমের দাসপ্রথা ও ইউরোপের সামন্ততান্ত্রিক এস্টেট ব্যবস্থার এক সম্মিলিত বিশেষ রূপ।"[৫১]

দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা ভারতীয় সনাতন জাতিবর্ণ ব্যবস্থা নানা কারণে এখন পরিবর্তনের মুখে পড়েছে। জাতিবর্ণ ব্যবস্থার বন্ধন অত্যন্ত দৃঢ় হলেও, ক্রমে সেখানে শিথিলতা দেখা দিয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন বর্ণের মাঝে সামাজিক মর্যাদায় আরোহণ কিংবা অবরোহণসূচক সচলতা বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। অতীতেও যে এমন ছিল না তা নয়, তবে তার মাত্রা ছিল অতি নগণ্য। সমাজবিজ্ঞানী শ্রীনিবাস 'সংস্কৃতায়ন' (Sanskritisation) প্রত্যয়ের মাধ্যমে বলতে চেয়েছেন যে, প্রাচীন কাল থেকেই বর্ণগত সচলতা সমাজে ক্রিয়াশীল ছিল। *Social Change in Modern India* (1989) শীর্ষক গ্রন্থে শ্রীনিবাস তাঁর সংস্কৃতায়ন তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন—সংস্কৃতায়ন হলো একটি সামাজিক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিচু জাতের হিন্দু বা আদিবাসী ও অপরাপর গোষ্ঠী স্বকীয় আচার-অনুষ্ঠান, আদর্শ, রীতি ও জীবনধারা পরিবর্তন করে, অপেক্ষাকৃত উঁচু জাতের বা দ্বিজ বর্ণের সমকক্ষ হতে চেষ্টা করে। এ রকমের পরিবর্তনের পরেই জাতি-বিন্যাসে তারা দাবি করে অধিকতর মর্যাদার স্থান। শ্রীনিবাস লিখেছেন—

> Sanskritization is the process by which a 'low' Hindu caste, and tribal or other group, changes its customs, ritual, ideology, and way of life in the direction of a high, and frequently, 'twice-born' caste. Generally such changes are followed by a claim to a higher position in the caste hierarchy than that traditionally conceded to the claimant caste by the local community.[৫২]

—অপেক্ষাকৃত নিচু জাতের মানুষের উঁচু জাতে উত্তরণ সহজে সামাজিক স্বীকৃতি পায় না। কিন্তু আস্তে আস্তে, দু-এক প্রবংশের (generation) ব্যবধানে সবার অলক্ষে তা

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন করে। প্রসঙ্গত শ্রীনিবাস লিখেছেন—"The claim is usually made over a period of time, in fact, a generation or two, before the 'arrival' is conceded."[৫৩]

কালস্রোতে ভারতবর্ষের ঐতিহ্যগত জাতিবর্ণ ব্যবস্থায় নানামাত্রিক পরিবর্তন ঘটেছে। একালে জাতিভেদ প্রথা বিশেষভাবে হীনবল হয়ে পড়েছে। জাতিবর্ণ ব্যবস্থার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যে-সব কারণ বা উপাদান বিশেষ ভূমিকা রেখেছে, তা হলো—নগরায়ণ (Urbanisation) শিল্পায়ন (Industrialisation), আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা (Modern education), আধুনিক অর্থ-ব্যবস্থা (Modern economic system), আধুনিক আইন ব্যবস্থা (Modern legal system) প্রভৃতি।[৫৪] এইসব প্রবণতা ও বৈশিষ্ট্যের কারণে জাতিবর্ণ ব্যবস্থায় বহুবিধ পরিবর্তন ঘটেছে। সামাজিক এই প্রবণতার ফলে জাতিবর্ণ ব্যবস্থার পরিবর্তন এবং সে-পরিবর্তনের প্রভাব গবেষণা এলাকা কদলপুর গ্রামে কীভাবে পড়েছে, তা বর্তমান অভিসন্দর্ভের চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে বিশদ ব্যাখ্যাসহ উপস্থাপিত হয়েছে।

হিন্দু সমাজের মতো জাতিবর্ণ প্রথা মুসলিম সমাজে নেই। তবে হিন্দু সমাজের চতুর্বর্ণ ভিত্তিক সামাজিক বিভাজনের অস্তিত্ব মুসলিম সমাজেও অলক্ষে ক্রিয়াশীল আছে বলে সমাজ-নৃবিজ্ঞানীরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী এ. কে. নাজমুল করিমের এই অভিমত—"It will be interesting here to note that in an attempt to conform itself to the requirements of the Indian social system, Islam in India patterned its social classes roughly in imitation of the four main Hindu caste divisions. The Indian Muslims used to 'fancifully' divide themselves into : (1) Syed, (2) Mughal, (3) Sheikh, and (4) Pathan; the Hindu counter-part being : (1) Brahmin, (2) Khshatriya, (3) Vaishya, and (4) Shudra."[৫৫] মুসলিম সমাজে জাতিবর্ণ ব্যবস্থা স্বীকৃত না হলেও আশরাফ-আতরাফ, খান্দানী বংশ ইত্যাদি প্রত্যয় ওই ব্যবস্থার পরোক্ষ অস্তিত্বের সাক্ষ্য বহন করে। বাংলাদেশের মুসলিম সমাজের উপর সনাতন জাতিবর্ণ ব্যবস্থার প্রভাব কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় সমাজ-নৃবিজ্ঞানী আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরীর এই অভিমত—

Dhaka University Institutional Repository

> Even in the Hindu dominated Indian society, the social hierarchy among the Muslims is not like the Hindu caste pattern. Though stratification among the Muslims in India is comparable with the Hindu caste system, there are also important differences. Caste exists among Indian Muslims but it is not like that of the Hindu because some of the characteristics of caste are not found among the Muslims. Nevertheless, caste among the muslims in India has been directly influenced by the Hindu caste system.[৫৩]

ভারতবর্ষের হিন্দুসমাজে সনাতন বর্ণপ্রথার মূল প্রবণতা এখনও ক্রিয়াশীল। সমাজের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও মান-মর্যাদার উপর উচ্চবর্ণের ব্যক্তিবর্গের অধিকার এখনও কম-বেশি অব্যাহত আছে। বহুমাত্রিক পরিবর্তন ঘটলেও জন্ম, বিয়ে, মৃত্যু, পারলৌকিক কর্ম, অধ্যাত্মসাধনা—ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিভিন্ন বর্ণের মানুষের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য এখনও পরিলক্ষিত হয়।

ভারতীয় বর্ণ-ব্যবস্থায় চারটি বর্ণ (Varna) থাকলেও, জাতির (Caste) সংখ্যা অনেক। প্রত্যেকটি বর্ণের মাঝেই রয়েছে অনেক জাতি। H. H. Risley-র গবেষণা থেকে ভারতবর্ষে মোট ৩৬০০ জাতির কথা জানা যায়। জাতির শাসনই এখন বেশি মাত্রায় ক্রিয়াশীল। কদলপুর গ্রামেও ব্রাহ্মণ ও নিম্ন-বর্ণের হিন্দুদের মধ্যে জাতির বিভাজন নানাভাবে লক্ষ করা গেছে।

ভারতীয় জাতিবর্ণ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ও চারিত্র্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত এই পর্যালোচনা শেষে কদলপুর গ্রামের উপর দৃষ্টিপাত করলে আমরা এই ব্যবস্থার নানামাত্রিক উপস্থিতি সেখানে প্রত্যক্ষ করবো—যা পরবর্তী অধ্যায়দ্বয়ে বিশদভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। ভারতীয় জাতিবর্ণ ব্যবস্থা কদলপুর গ্রামের মুসলিম সমাজে কীভাবে ক্রিয়াশীল আছে, তা-ও আমরা বিস্তৃতভাবে সেখানে তুলে ধরেছি। একই সঙ্গে সনাতন জাতিবর্ণ ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রবণতাও সেখানে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

১. Don Martindale, *The Nature and Types of Sociological Theory* (Boston : Houghton Miffin Company, 1960), p. 64

২. দ্রষ্টব্য : *The Oxford English Dictionary*, 17th edition (London : 1988), p. 64

৩. দ্রষ্টব্য : *Chamber's Encyclopaedia*, 30th edition, London : 1991, p. 37

৪. Vidyabhushan and D. R. Sachdeva, *An Introduction to Sociology* (Allahabad : Kitabmahal, 1980), p. 13

৫. Andre Beteille, *Caste, Class and Power : Changing Patterns of Stratification in a Tanjore Village* (Delhi : Oxford University Press, 1996), p. 46

৬. M. N. Srinivas, *Village, Caste, Gender and Method* (Delhi : Oxford University Press, 1996), pp. 121-22

৭. C. H. Colley, *Social Organization* (Bombay : Oxford University Press, 1981), p. 28

৮. R. M. MacIver, *Society : A Text Book of Sociology* (London : Macmillan, 1978), p. 33

৯. T. B. Bottomore, *Sociology : A Guide to Problems and Literature* (New Delhi : Blackie & Son (India) Limited, 1975), p. 189

১০. W. A. Anderson and F. B. Parker, *Society : Its Organization and Operation* (New York : Doubleday, 1968), p. 122

১১. G. A. Lundberg, *Foundations of Sociology* (London : Free Press, 1978), p. 183

১২. Arnold Green, *Sociology* (London : Heinemann, 1981), p. 88

১৩. Louis Dumont, *Homo Hierarchicus : The Caste System and Its Implications* (Translated by Mark Sainsbury et. al. : Delhi : Oxford University Press, 1998), p. 21

Dhaka University Institutional Repository

১৪. বিভিন্ন সূত্র পর্যালোচনা করে সমাজ-নৃতাত্ত্বিক-ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন যে, অন্তত খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের পূর্ব থেকেই বর্ণাশ্রম প্রথা ভারতীয় সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়।

দ্রষ্টব্য : Vincent A. Smith, *The Oxford History of India* (Oxford : Oxford University Press, 1961), p. 64

১৫. স্বরোচিষ সরকার, *অস্পৃশ্যতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ* (ঢাকা : প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ২০০৫), পৃ. ১৪

১৬. *শ্রীমদ্ভগবদগীতা* (প্রাণকুমার ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত), (ঢাকা : নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ১৯৯০), পৃ. ৮২-৮৩

১৭. বিনয় ঘোষ, *বাংলার নবজাগৃতি* (কলকাতা : ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১৯৭৯) পৃ. ১৭৮

১৮. বৃন্দাবন দাস, *চৈতন্যভাগবত*। উদ্ধৃত : হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা* (কলকাতা : জিজ্ঞাসা, ১৯৭০), পৃ. ১১

১৯. Romila Thapar, *A History of India*, Vol. II (Middlesex : Penguin Books, 1966), pp. 29-30

২০. ঋগ্বেদ, শ্লোক : ১০ : ৯০: ১২। *ঋগ্বেদ সংহিতা* (সম্পাদক : রমেশচন্দ্র দত্ত ; কলকাতা : ঈশ্বরচন্দ্র বসু, ১৮৮৬), পৃ. ৭০৪

২১. স্বরোচিষ সরকার, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নম্বর ১৫, পৃ. ১৪

২২. G. S. Ghurye, *Caste and Race in India* (Bombay : Popular Prokashan, 1996), p. 47

২৩. G. S. Ghurye, ibid, p. 44

২৪. G. S. Ghurye, ibid, pp. 44-45

২৫. অনাদিকুমার মহাপাত্র, *বিষয় সমাজতত্ত্ব* (কলকাতা : ইন্ডিয়ান বুক কনসার্ন, ১৯৯৮), পৃ. ৫৩১

২৬. J. H. Hutton, *Caste in India* (Bombay, Oxford University Press, 1968), pp. 34-35

Dhaka University Institutional Repository

২৭. ইরফান হাবিব, *ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গ* (অনুবাদ : কাবেরী বসু : কলকাতা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৯), পৃ. ১৩৯

২৮. See : K. M. Panikkar, *Hindu Society at Crossroads* (Delhi : Oxford University Press, 1955), p. 83

২৯. T. B. Bottomore, *Sociology: A Guide to Problems and Literature*, ibid, p. 191

৩০. Ibid, p. 189

৩১. Ibid, p. 190

৩২. Veena Das, *Structure and Cognition : Aspect of Hindu Caste and Ritual* (Delhi : Oxford Unversity Press, 1990), p. 68

৩৩. D. D. Kosambi, *An Introduction to the Study of Indian History* (Bombay : Vikas Publishing House Pvt. Ltd., 1956), p. 25

৩৪. ইরফান হাবিব, *ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৪

৩৫. D. D. Kosambi, ibid, note No. 33, p. 14

৩৬. ইরফান হাবিব, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নম্বর ২৭, পৃ. ১৪৫

৩৭. Max Weber, *The Religion of India : The Sociology of Hinduism and Buddhism* (English Translation by Hans H. Gerth and Don Martindale; Glencoe: Orient, 1958), p. 29

৩৮. William Henricks Wiser, *The Hindu Jajmani System : A Socio-Economic System Interrelating Members of a Hindu Village Community in Services* (Lucknow : Lucknow Publishing House, 1956), pp. 31-53

৩৯. Louis Dumont, *Homo Hierarchicus*, ibid, note No.13, pp. 26, 166, 350, 421

৪০. ইরফান হাবিব, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নম্বর ২৭, পৃ. ১৪৬

৪১. মনোহর বিশ্বাস, "জাতিভেদ : সেকাল ও একাল", *জিজ্ঞাসা* (সম্পাদক : শিবনারায়ণ রায়), দ্বাবিংশ সংখ্যা, ১৩৭৮, কলকাতা, পৃ. ৪০৫

Dhaka University Institutional Repository

৪২. Veena Das, ibid, note No. 32, p. 75

৪৩. G. S. Ghurye, *Class, Caste and Occupation* (Bombay : Popular Book Depot., 1964), p.37

৪৪. মুহাম্মাদ হাবিবুর রহমান, *সামাজিক অসমতা* (ঢাকা : হাসান বুক হাউস, ১৯৯৫), পৃ. ১৬৬

৪৫. রামশরণ শর্মা, *প্রাচীন ভারতে শূদ্র* (কলকাতা : কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৮৯), পৃ. ৩২

৪৬. রংগলাল সেন, *বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাস* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), পৃ. ৭

৪৭. অতুল সুর, *বাংলার সামাজিক ইতিহাস* (কলকাতা : জিজ্ঞাসা, দ্বি. সং. ১৯৮২), পৃ. ৩২

৪৮. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস : আদিপর্ব* (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, দ্বি., সং. ১৪০২), পৃ. ২৫৩-৫৪

৪৯. Veena Das, ibid, note No. 32, pp. 85-86

৫০. রংগলাল সেন, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নম্বর ৪৬, পৃ. ৪৩

৫১. রংগলাল সেন, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নম্বর ৪৬, পৃ. ৭

৫২. M. N. Srinivas, *Social Change in Modern India* (Bombay : Asia Publishing House, 1989), p. 47

৫৩. M. N. Srinivas, ibid, p. 49

৫৪. অনাদিকুমার মহাপাত্র, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নম্বর ২৫, পৃ. ৫৩৯

৫৫. A. K. Nazmul Karim, *Changing Society in India, Pakistan and Bangladesh* (Dhaka : Nawroze Kitabistan, 1996), p. 163

৫৬. Anwarullah Chowdhury, *A Bangladesh Village : A Study of Social Stratification* (Dhaka : Centre for Social Studies, 1978), p. 79.

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

কদলপুর গ্রামের আর্থ-সামাজিক-ভৌগোলিক পরিচিতি

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

কদলপুর গ্রামের আর্থ-সামাজিক-ভৌগোলিক পরিচিতি

কদলপুর গ্রাম চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানায় অবস্থিত। এটি একটি প্রত্যন্ত গ্রাম। চট্টগ্রাম শহর থেকে ৩৫ কিলোমিটার পশ্চিম-উত্তরদিকে অবস্থিত কদলপুর গ্রাম একটি প্রাচীন জনপদ। চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি সড়কপথে রাউজান উপজেলা শহর থেকে ৫ কিলোমিটার পশ্চিম-উত্তর দিকে কদলপুর গ্রাম অবস্থিত। গ্রামটি ৩৫৫ একর বা আধ বর্গমাইলের কিছুটা বেশি জায়গা জুড়ে বিস্তৃত। সড়ক যোগাযোগই গ্রামটির একমাত্র যাতায়াতের ব্যবস্থা। জলপথে এ গ্রামে পৌঁছার কোনো ব্যবস্থা নেই। এক সময় খালের মাধ্যমে জলপথের ব্যবস্থা ছিল; কিন্তু বর্তমানে খালগুলো ভরাট হয়ে একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে।

যতদূর জানা যায়, দেশ-বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত কদলপুর গ্রামের নাম ছিল রায়চাঁদ পাড়া। পুরোনো পরচা এবং নথিপত্রে এখনো রায়চাঁদ পাড়ার অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। তবে ১৯৪৭-উত্তর কালে রায়চাঁদ পাড়ার নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় কদলপুর। রায়চাঁদ পাড়ার নাম কেন পরিবর্তন করা হলো, পরিবর্তনের উদ্যোগ কীভাবে নেওয়া হলো—এসব বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য আমরা সকল উৎসে অনুসন্ধান করেছি। কিন্তু এ ব্যাপারে সরকারি দপ্তরে কিংবা ইউনিয়ন পরিষদ অফিসে কোনো কাগজপত্রই পাওয়া যায় নি। গ্রামের প্রবীণ ব্যক্তিরাও এ বিষয়ে প্রকৃত কোনো তথ্য আমাকে জানাতে সমর্থ হন নি।

কদলপুর আকারে ছোট একটি গ্রাম। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, আকারে ছোট হলেও এই গ্রামের নামানুসারেই কদলপুর ইউনিয়নের নামকরণ হয়েছে। কদলপুর ইউনিয়ন অনেক বড়, কিন্তু কদলপুর গ্রাম খুবই ছোট। ছোট একটি গ্রামের নামে ইউনিয়নের নাম রাখা হলো কেন, এ প্রশ্নের জবাবে ৩ নম্বর কদলপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ ফরুক হোসেন জানিয়েছেন যে, ইউনিয়নের কেন্দ্রে

Dhaka University Institutional Repository

কদলপুর গ্রাম অবস্থিত বলেই হয়তো এমন নামকরণ হয়েছে।[১] কদলপুর গ্রামের উত্তরে খলিলাবাদ গ্রাম, পূর্বে রমজান আলী হাট, পশ্চিমে উত্তর গুজরা এবং দক্ষিণে আন্ধারমানিক ও পূর্ব গুজরা গ্রাম অবস্থিত। নিচে কদলপুর গ্রামের ভৌগোলিক অবস্থান দেখানো হলো—

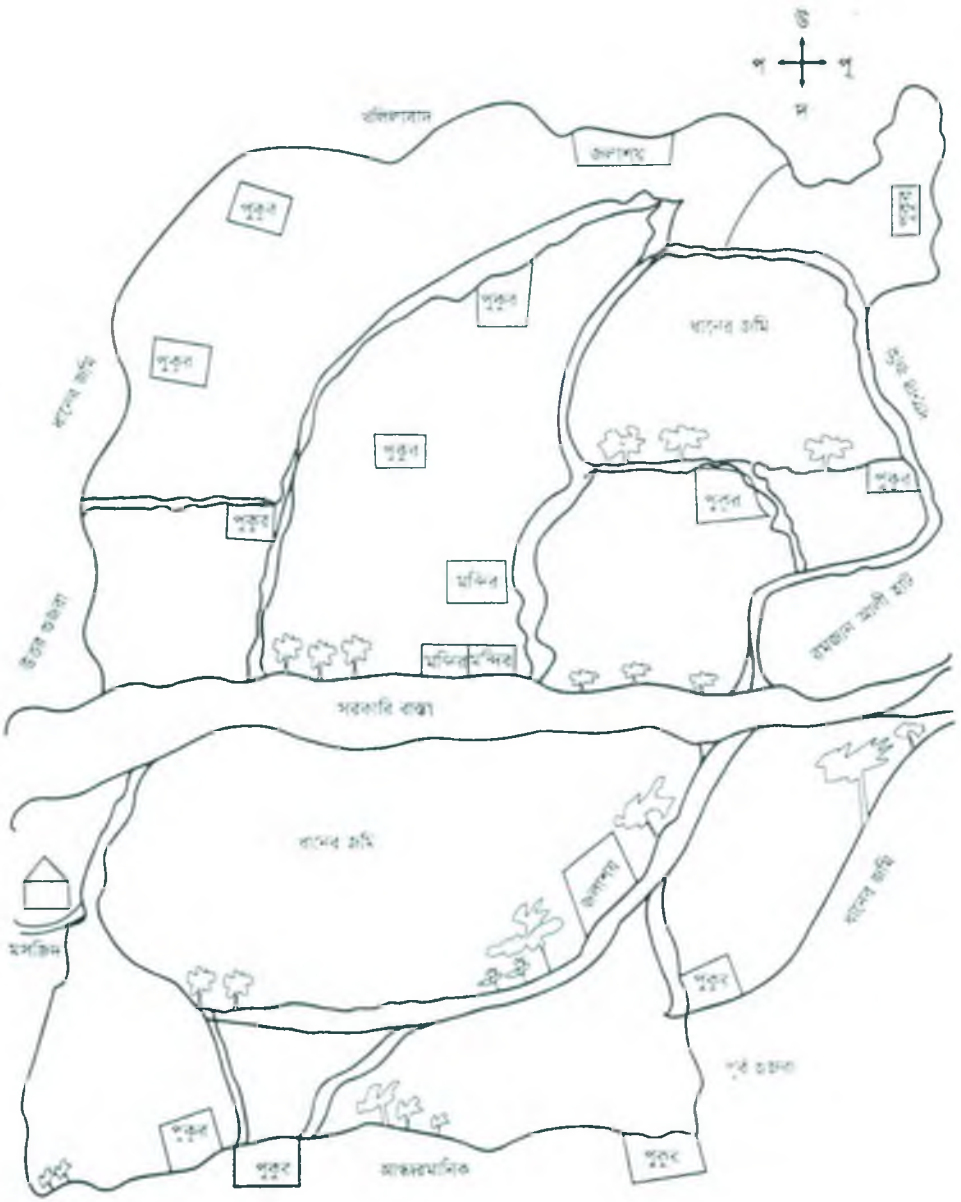

সারণি-১ : কদলপুর গ্রামের ভৌগোলিক অবস্থান

১৬ ফুট চওড়া সরকারি রাস্তা কদলপুর গ্রামকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছে। রাস্তার পাশেই আছে সরু খাল। এক সময় এই খাল বেশ বড় এবং স্রোতময় ছিল। কিন্তু এখন ভরাট

Dhaka University Institutional Repository

হয়ে গেছে; কোথাও কোথাও বাঁধ দিয়ে খালের অস্তিত্বই বিপন্ন করা হয়েছে। অতীতে খালটি কাগতিয়া খাল নামে পরিচিত ছিল। এখনও সরকারি কাগজপত্র ও পরচায় কাগতিয়া খালের অস্তিত্ব টিকে আছে, তবে বাস্তবে খালটি নেই বললেই চলে।

কদলপুর গ্রামে ফসলের জমির পরিমাণ খুবই কম। ফলে এ গ্রামের মানুষ ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি বা অন্য কোনো পেশার সঙ্গে জড়িত। কৃষি-আয় থেকে জীবিকা নির্বাহ করে এমন মানুষের সংখ্যা এ গ্রামে অতি স্বল্প। সরকারি রাস্তাটিই গ্রামের যোগাযোগের প্রধান উৎস। তবে এক পাড়া থেকে অন্য পাড়ায় যেতে অনেক ছোট রাস্তা আছে। বর্ষাকালে অধিকাংশ রাস্তাই কাদায় পূর্ণ হয়ে যায়। তখন চলাচল করা রীতিমতো দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। সরকারি রাস্তাটির কিছু অংশে সম্প্রতি ইট বিছানো হয়েছে। শুকনো মৌসুমে রাস্তায় সাইকেল, রিক্সা ও ভ্যান মাঝে মাঝে চলাচল করে, কখনো কখনো জীপ বা গাড়িও এপথে চলাচল করে। বাংলাদেশের অন্যান্য গ্রামের মতো কদলপুর গ্রামেও আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। ফলে যোগাযোগের ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটছে, পরিবর্তন ঘটছে জীবনযাত্রার নানা প্রান্তে। এখন এ গ্রামের প্রায় সব বাড়িতেই স্যাটেলাইট টিভির সংযোগ দেখা যায়।

সরকারি রাস্তায় একটি বড় ব্রিজ কদলপুর গ্রামকে উত্তর গুজরার সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। ব্রিজটি তৈরি হয়েছে বড় খালের উপর। এছাড়া মূল রাস্তা থেকে বিভিন্ন পাড়ায় যেতে ছোট ছোট খালের উপর বাঁশের তৈরি সাঁকো ব্যবহৃত হয়। কদলপুর গ্রামে ছোট-বড় মিলে ১৪টি পুকুর বা জলাশয় আছে। এসব জলাশয় গ্রামবাসীদের নিত্য-নৈমিত্তিক কাজে ব্যবহৃত হয়। অতীতে এসব জলাশয় থেকেই জল সংগ্রহ করতো মানুষ রান্না ও পানের জন্য। তবে বর্তমানে অধিবাসীরা টিউবওয়েলের জল ব্যবহার করে। অতীতে খাল ও জলাশয়ে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত। এখন তেমন মাছ পাওয়া যায় না। চারটি জলাশয়ে মাছের চাষ করা হয়। মাছের চাষ জনপ্রিয় হলেও পুকুর বা জলাশয়ের অভাবে আগ্রহ থাকলেও অনেকে এ কাজে অগ্রসর হতে পারছে না।

পূর্বেই ব্যক্ত হয়েছে যে, কদলপুর গ্রামে ফসলি জমির পরিমাণ খুবই কম। যে-কয়টি পরিবার জমির মালিক, তারা জমিতে আউশ ও আমন ধান উৎপাদন করে। অনেক গৃহস্থই বাড়ির উঠানে বা ঘরের চারদিকে তরি-তরকারি উৎপাদন করে নিজেদের চাহিদা মিটিয়ে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

কদলপুর গ্রাম প্রধানত নিচু-ভূমি (low-lying area)। ফলে গ্রামে মানুষের বসবাস তুলনামূলকভাবে বেশ কম। হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ মিলে কদলপুর গ্রামে মোট ৯০টি পরিবার বাস করে। বর্তমানে গ্রামের জনসংখ্যা মোট ৪৬৫ জন। এর মধ্যে হিন্দু ৪১৫ জন, মুসলিম ৪১ জন এবং বৌদ্ধ ৯ জন। হিন্দু পরিবারের সংখ্যা ৮১টি, মুসলিম ৭টি এবং বৌদ্ধ ২টি। নিচের সারণিতে কদলপুর গ্রামের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জনসাধারণের সংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্য উপস্থাপিত হলো—

ধর্ম	মোট গৃহস্থ	মোট জনসংখ্যা	শতকরা হার
হিন্দু	৮১	৪১৫	৮৯.২৫%
মুসলিম	০৭	৪১	৮.৮২%
বৌদ্ধ	০২	০৯	১.৯৪%

সারণি- ২ : কদলপুর গ্রামের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর সংখ্যাতাত্ত্বিক পরিচিতি

কদলপুর গ্রামের শতকরা ৯০ ভাগ মানুষই হিন্দু ধর্মাবলম্বী। ভারতীয় জাতিবর্ণ ব্যবস্থায় যে চতুর্বর্ণের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র) কথা পাওয়া যায়, কদলপুর গ্রামের জাতিবর্ণ ব্যবস্থা তার অনুরূপ নয়। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য বলতে কোনো বর্ণই এখানে নেই। কদলপুরের বর্ণ-ব্যবস্থায় আমরা তিনটি বর্ণের উপস্থিতি লক্ষ করেছি। উচ্চ-বর্ণ (Upper Caste), নিম্ন-বর্ণ (Lower Caste), এবং নমঃশূদ্র (Scheduled Caste)—এই তিন বর্ণে এ গ্রামের হিন্দু অধিবাসীরা বিভক্ত। উচ্চ-বর্ণের মধ্যে আবার আছে দুটো মর্যাদা- স্তর—১. ব্রাহ্মণ, ২. অন্যান্য উচ্চ-বর্ণ। উচ্চ-বর্ণের মধ্যে মর্যাদার দৃষ্টিতে ব্রাহ্মণদের অবস্থান উচ্চে, তারপর আছে অন্যান্য উচ্চ-বর্ণের হিন্দু। ভারতীয় জাতিবর্ণ ব্যবস্থার যে কঠোরতার কথা জানা যায়, কদলপুর গ্রামে সে-কঠোরতাও আমাদের পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েনি। কদলপুর গ্রামে ক্রিয়াশীল বর্ণ-ব্যবস্থাকে আমরা নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করতে পারি—

ক. উচ্চ-বর্ণ (Upper caste);

খ. নিম্ন-বর্ণ (Lower caste);

গ. নমঃশূদ্র (Scheduled caste)।

পূর্বেই ব্যক্ত হয়েছে যে, কদলপুর গ্রামে তিন বর্ণের লোক মিলে হিন্দু ধর্মাবলম্বী মোট জনসংখ্যা ৪১৫ জন। নিচের সারণিতে কদলপুর গ্রামের হিন্দু জনগোষ্ঠীর মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

ক্রিয়াশীল বিভিন্ন বর্ণের মানুষের অবস্থান প্রদত্ত হলো। উল্লেখ্য, এই তিন বর্ণ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে আলোচ্য অভিসন্দর্ভের চতুর্থ অধ্যায়ে। কদলপুর গ্রামের হিন্দু জনগোষ্ঠীর মর্যাদা ও বর্ণগত অবস্থান—

বর্ণ	গৃহস্থ	জনসংখ্যা	শতকরা হার
উচ্চ-বর্ণ	২৯	১৪৩	৩৪.৪৪%
নিম্ন-বর্ণ	৪৪	২২০	৫৩.০১%
নমঃশূদ্র	০৮	৫২	১২.৫৩%

সারণি- ৩ : কদলপুর গ্রামের হিন্দু জনগোষ্ঠীর বর্ণগত তথ্য

কদলপুর গ্রামে ব্রাহ্মণ আছে মোট চার পরিবার। ব্রাহ্মণরা সামাজিক মর্যাদার শীর্ষে থাকলেও কদলপুর গ্রামের সামাজিক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করে অন্যান্য উচ্চ-বর্ণের হিন্দুরা। অন্যান্য উচ্চ-বর্ণের হিন্দুদের মধ্যে আছে সরকার, চৌধুরী, দত্ত, দে এবং তালুকদার পদবীধারী মানুষ। কদলপুর গ্রামে লক্ষ করা গেছে যে, ভিন্ন ভিন্ন পদবীধারী হিন্দুরা ভিন্ন ভিন্ন পাড়ায় বাস করে। ছোট সরু রাস্তা দিয়ে এক পাড়া থেকে অন্য পাড়া বিভক্ত। লক্ষণীয় যে প্রতি পাড়াতেই রয়েছে কমপক্ষে একটি বড় পুকুর বা জলাশয়। নির্দিষ্ট জলাশয়ের জল ওই পাড়ায় মানুষেরা ব্যবহার করে। এক্ষেত্রে দে পাড়ার জলাশয়টির কথা বিশেষভাবে বলতে হয়। আকারে এটিই সবচেয়ে বড় এবং গ্রামের বিভিন্ন ধর্মীয় কৃত্যের জল ওই জলাশয় থেকে সংগ্রহ করা হয়। দুর্গাপূজার শেষে দেবী দুর্গার প্রতিমাও এই পুকুরে বিসর্জন দেওয়া হয়। নিচের সারণিতে কদলপুর গ্রামের উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্য দেখানো হলো—

পদবী	মোট গৃহস্থ	জনসংখ্যা	শতকরা হার
সরকার	১২	৫৭	৪৬.৭২%
চৌধুরী	০৪	২০	১৬.৩৯%
দত্ত	০২	১০	৮.২০%
দে	০৪	২১	১৭.২১%
তালুকদার	০৩	১৪	১১.৪৮%

সারণি-৪ : অ-ব্রাহ্মণ উচ্চ-বর্ণের হিন্দুদের সংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্য

Dhaka University Institutional Repository

সংখ্যার দিক থেকে কদলপুর গ্রামে নিম্ন-বর্ণের হিন্দুরাই সবচেয়ে বেশি। কদলপুর গ্রামে মোট ৪৪টি পরিবার নিম্ন-বর্ণভুক্ত। নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে আছে দাস, ভূঁইমালী, প্রামাণিক (নাপিত), রজকদাস (ধোপা) এবং বণিক পদবীধারী মানুষ। এটা খুবই কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ করা গেছে যে, উচ্চবর্ণের হিন্দুরা গ্রামের নানা পাড়ায় ছড়িয়ে থাকলেও নিম্ন-বর্ণের হিন্দুরা গ্রামের উত্তর-পূর্ব কোণে এক পাড়ায় ঘনীভূত হয়ে বসবাস করছে। গ্রামের অন্য পাড়ার তুলনায় এখানে জনবসতির ঘনত্ব অনেক বেশি। নিম্ন-বর্ণের হিন্দুদের প্রায় সবাই অর্থনৈতিকভাবে অস্বচ্ছল। দুর্দশা-দুর্গতির মধ্য দিয়ে তারা জীবন নির্বাহ করে। নিচের তালিকা থেকে কদলপুর গ্রামের নিম্ন-বর্ণের হিন্দুদের সংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্য পাওয়া যাবে—

পদবী	গৃহস্থ	জনসংখ্যা	শতকরা হার
দাস	২৭	১৩১	৫৯.৫৫%
ভূঁইমালী	০৭	৩৭	১৬.৮২%
প্রামাণিক	০২	১২	৫.৪৫%
রজকদাস	০১	৬	২.৭৩%
বণিক	০৭	৩৪	১৫.৪৫%

সারণি -৫ : নিম্ন-বর্ণের হিন্দুদের সংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্য

কদলপুর গ্রামের নমঃশূদ্র পাড়া গ্রামের পূর্ব-উত্তরপূর্ব কোণে একেবারে প্রান্তে অবস্থিত। সরকারি রাস্তা থেকে নমঃশূদ্র পাড়া অনেক দূরে অবস্থিত বলে সেখানে যাতায়াত করা আজকের দিনেও বেশ কষ্টসাধ্য। বিশেষ করে বর্ষাকালে নমঃশূদ্র পাড়ায় যাতায়াত রীতিমতো দুঃসাধ্য। নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মতো নমঃশূদ্ররাও এ গ্রামে একস্থানে ঘনীভূত হয়ে বসবাস করছে; ফলে এ পাড়ায় লোকবসতির ঘনত্ব খুব বেশি। এ গ্রামে মাত্র ৮ ঘর নমঃশূদ্র বাস করে। ৮ ঘরের মধ্যে ৩ ঘরে বাড়ুই এবং ৫ ঘরে মণ্ডল পদবীধারী মানুষ বাস করে। বাড়ুইরা পানের বরজে কাজ করে, আর মণ্ডলরা মৎস্য শিকার ও কামলার কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। নিচে কদলপুর গ্রামের নমঃশূদ্রদের সংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্য দেওয়া হলো—

Dhaka University Institutional Repository

পদবী	গৃহস্থ	জনসংখ্যা	শতকরা হার
বাড়ুই	৩	২০	৩৮.৪৭%
মণ্ডল	৫	৩২	৬১.৫৩%

সারণি -৬ : নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্য

কদলপুর গ্রামের বিভিন্ন পাড়ায় যেভাবে হিন্দু জনগোষ্ঠী বিন্যস্ত হয়ে বসবাস করছে, তা-ও জাতিবর্ণের ধারণা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলে মনে হয়। দেখা যাচ্ছে ব্রাহ্মণ বা উচ্চ-বর্ণের হিন্দুরা বিশেষ বিশেষ পাড়ায় বাস করছে, নিম্ন-বর্ণের হিন্দু বা নমঃশূদ্রদের পাড়া একেবারে গ্রাম-প্রান্তে। মুসলিমদের পাড়াও গ্রামের অপর প্রান্তে। লক্ষণীয়, উচ্চ-বর্ণের হিন্দুদের পাড়ায় কোনো নিম্ন-বর্ণ কিংবা নমঃশূদ্র বাস করে না, কিংবা নিম্ন-বর্ণের হিন্দু অথবা নমঃশূদ্র পাড়ায় উচ্চ-বর্ণের কেউ বাস করে না। বর্ণজাত সামাজিক দূরত্ব এবং বৈষম্যের কারণেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সামাজিক ক্রিয়াকর্মের সময় এক পাড়ার মানুষ অন্য পাড়ায় যায়—মিলেমিশে কাজ করে। তবে, ধর্মীয় কৃত্য পালনের সময় তাদের মাঝেই প্রবল হয়ে ওঠে বর্ণপ্রথার রীতি ও সংস্কার।

কদলপুর গ্রামে কাছাকাছি তিনটি মন্দির রয়েছে। হিন্দুদের যাবতীয় ধর্মীয় কৃত্য এই তিনটি মন্দিরকে ঘিরেই আবর্তিত। মন্দিরে উচ্চ-বর্ণ ও নিম্ন-বর্ণের হিন্দুরা পূজা দেয়। নমঃশূদ্ররা পূজা দেখতে আসে; তবে তাতে অংশগ্রহণ করতে পারে না। নিম্ন-বর্ণের হিন্দুপাড়া কিংবা নমঃশূদ্র পাড়ায় স্থায়ী কোনো মন্দির নেই। পূজা-পার্বণের জন্য নিম্ন-বর্ণের হিন্দুরা উচ্চ-বর্ণের সরকার পাড়ার মন্দিরে যায়। সরকার পাড়ায় যে তিনটি মন্দির রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হচ্ছে শ্রী সুরেন্দ্রবিজয় সরকারের বাটিস্থ মাতৃমণ্ডপ। এখানে প্রতিবছর দুর্গা পূজা, কালী পূজা, লক্ষ্মী পূজা, মনসা পূজা ইত্যাদি পূজা অনুষ্ঠিত হয়। সরকার পাড়া সংলগ্ন সরকারি রাস্তার পাশেই সম্প্রতি নির্মিত হয়েছে দু'টি মন্দির—মগধেশ্বরী মন্দির এবং বটেশ্বর ত্রিমূর্তি মন্দির। মন্দির দুটি রাস্তার পার্শ্বে পাশাপাশি অবস্থিত। মগধেশ্বরী মন্দিরকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর পৌষ-সংক্রান্তিতে উত্তরায়ণ অনুষ্ঠান ও গ্রামীণ মেলা বসে থাকে। এসময় সমগ্র গ্রাম উৎসব-আনন্দে মুখরিত হয়ে ওঠে।[১]

Dhaka University Institutional Repository

কদলপুর গ্রামে মোট ৭ পরিবার মুসলিম আছে। গ্রামের মোট জনসংখ্যার হিসেবে শতকরা ৮.৮২% মানুষ মুসলিম। ৭ পরিবার মুসলিমের মধ্যে দু'টি পরিবার অভিজাত বা খান্দান মর্যাদার, বাকি পাঁচ পরিবার নিম্নস্তরের তথা দিন মজুর। নিম্নস্তরের দিনমজুর মুসলিমদের গ্রামে 'গৃহস্থ' নামে আখ্যায়িত করা হয়। মুসলিম সমাজে হিন্দুদের অনুরূপ জাতিবর্ণ ব্যবস্থার প্রচলন নেই। তবে পাশাপাশি অবস্থানের কারণে হিন্দুদের জাতিবর্ণ ব্যবস্থার নানামাত্রিক প্রভাব পড়েছে মুসলিম জনগোষ্ঠীর উপর। খান্দান এবং গৃহস্থ মুসলিম এই নামকরণের মাঝেই লুকিয়ে আছে হিন্দু জাতিবর্ণ ব্যবস্থার প্রভাব।[৩] তবে মুসলিমদের সামাজিক দূরত্বের বা বৈষম্যের ভিত্তি ভিন্ন।

কদলপুর গ্রামের মুসলিম পাড়ায় দু'টো বংশমর্যাদার লোক বাস করে। অভিজাতরা কাজী বংশ মর্যাদায় পরিচিত; অন্যদিকে, গৃহস্থ কামলারা মোল্লা পদবীধারী। মুসলিম সমাজে দুই বংশমর্যাদা মিলে মোট ৪১জন মানুষ বাস করে কদলপুর গ্রামে। মর্যাদাগত বিভাজনে আলোচ্য গ্রামের মুসলিম জনগোষ্ঠীকে নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা যায়—

বংশ	গৃহস্থ	জনসংখ্যা	শতকরা হার
কাজী	০২	১১	২৬.৮৩%
মোল্লা	০৫	৩০	৭৩.১৭%

সারণি -৭ : মুসলিম জনগোষ্ঠীর সংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্য

কদলপুর গ্রামের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে মুসলিম পাড়া অবস্থিত। মুসলিম পাড়ার পূর্ব-দক্ষিণ কোণে একটি বড় জলাশয় আছে। সাত পরিবারের মানুষ নিত্য-নৈমিত্তিক কাজে এই জলাশয়ের পানি ব্যবহার করে। গ্রামের একেবারে পশ্চিম প্রান্তে মুসলিম পাড়া ঘেঁষে রয়েছে একটি ছোট মসজিদ। এ মসজিদেই মুসলিমরা নামাজ আদায় করে থাকেন।

কদলপুর গ্রামে ২ পরিবার বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষ বাস করে। দুই পরিবার বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর ঘরে মোট মানুষ রয়েছে ৯ জন, যা গ্রামের মোট জনসংখ্যার শতকরা ১.৯৪ ভাগ। বৌদ্ধদের মাঝে হিন্দু ধর্মের অনুরূপ বর্ণ-বিন্যাস ও স্তর-বিভাজন নেই, মুসলিম সমাজের মতোও নেই বর্ণ ব্যবস্থার অপ্রকাশ্য প্রভাব। মূলত ফসলি জমির আয়ের

Dhaka University Institutional Repository

উপরেই নির্ভরশীল এই বৌদ্ধ পরিবারদ্বয়। গ্রামের অন্য মানুষের সঙ্গে যেমন, তেমনি পার্শ্ববর্তী গ্রামের বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর সঙ্গে কদলপুর গ্রামের বৌদ্ধ পরিবারদ্বয়ের রয়েছে নিবিড় সখ্য। নিচে কদলপুর গ্রামের হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর অবস্থান দেখানো হলো—

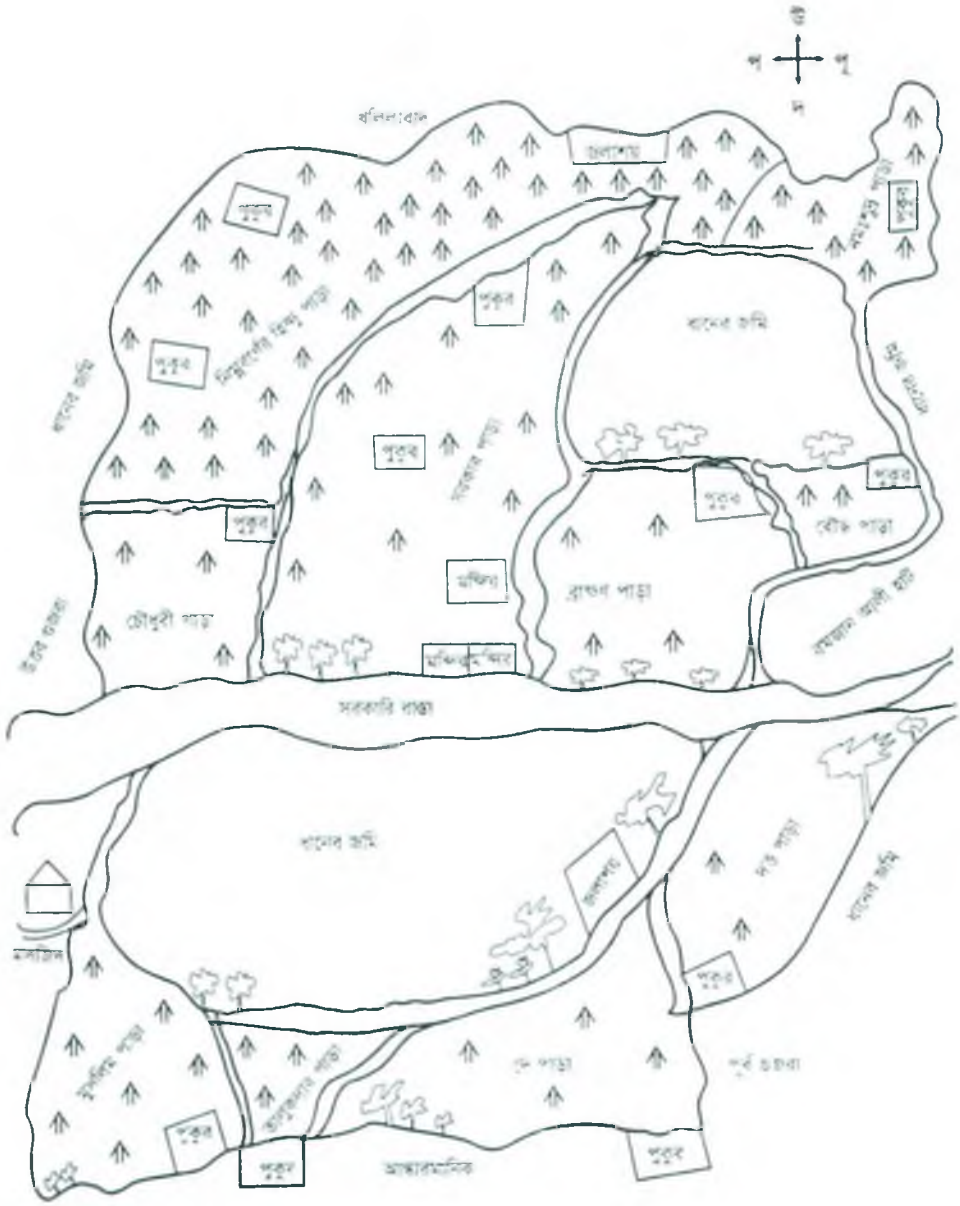

সারণি-৮ : কদলপুর গ্রামের বিভিন্ন পাড়া

তথ্যসংগ্রহ কালে আমি খুবই আনন্দের সঙ্গে লক্ষ করেছি, কদলপুর গ্রামের বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠীর মানুষদের মধ্যে চমৎকার সম্প্রীতি বিরাজ করছে। পরস্পর পরস্পরের

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মাচরণের প্রতি পরম শ্রদ্ধাশীল ও সহানুভূতিপ্রবণ। সরকার পাড়ার শ্রী সুরেন্দ্রবিজয় সরকার বাটিস্থ মাতৃমণ্ডপে দুর্গা পূজার সময় সমগ্র গ্রাম যেন একাত্ম হয়ে যায়। হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ নির্বিশেষে সকলে আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। অন্যদিকে ঈদ বা বৌদ্ধ পূর্ণিমার সময়ও দেখা যায় সকল ধর্মাবলম্বীর মানুষই আনন্দে উদ্বেলিত। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে এই সম্প্রীতি কদলপুর গ্রামের সামাজিক চারিত্র্যের বিশিষ্ট লক্ষণ বলে উল্লেখ করতে হয়।

শ্রী সুরেন্দ্রবিজয় সরকার বাটিস্থ মাতৃমণ্ডপকে কেন্দ্র করে কদলপুর তরুণ সঙ্ঘ নামে একটি যুবকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের কথা উল্লেখ না করলেই নয়। গ্রামের নানা কর্মকাণ্ডে এই সঙ্ঘ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিয়ে, পূজা, শ্রাদ্ধ, কিংবা ঈদ উদযাপন—এসব উৎসবে অধিক সংখ্যক মানুষ নিমন্ত্রিত হলে তরুণ সঙ্ঘের সাহায্য বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। গ্রামের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রেও এই সঙ্ঘ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সঙ্ঘের মালিকানায় হাড়ি-পাতিল-বালতি ইত্যাদি সামগ্রী রয়েছে, রয়েছে অস্থায়ী ছাউনি দেওয়ার মতো পর্যাপ্ত উপকরণ। বিয়ে বা এ জাতীয় কোনো অনুষ্ঠানে সঙ্ঘের সদস্যরাই মূল দায়িত্ব পালন করে থাকে। উল্লেখযোগ্য যে, জাতিবর্ণ ব্যবস্থা ক্রিয়াশীল থাকলেও, কদলপুর তরুণ সঙ্ঘের মধ্যে তার কোনো প্রভাব নেই। নিচে কদলপুর গ্রামের বিভিন্ন পাড়ার জনসংখ্যার চিত্র উপস্থাপিত হলো—

পাড়া	গৃহস্থ	মোট জনসংখ্যা
ব্রাহ্মণপাড়া	০৪	২১
সরকার পাড়া	১২	৫৭
চৌধুরী পাড়া	০৪	২০
দত্ত পাড়া	০২	১০
দে পাড়া	০৪	২১
তালুকদার পাড়া	০৩	১৪
নিম্নবর্ণের হিন্দু পাড়া	৪৪	২২০
নমঃশূদ্র পাড়া	০৮	৫২
মুসলিম পাড়া	০৭	৪১
বৌদ্ধ পাড়া	০২	০৯
মোট ৯০টি পরিবার		মোট জনসংখ্যা ৪৬৫

সারণি-৯ : কদলপুর গ্রামের পাড়াভিত্তিক গৃহস্থ ও জনসংখ্যার তথ্য

Dhaka University Institutional Repository

কদলপুর গ্রামে কোনো দোকান বা বাজার নেই। নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পার্শ্ববর্তী রমজান আলী হাট থেকে ক্রয় করে এ গ্রামের মানুষ। পায়ে হেঁটেই তারা হাটে আসা-যাওয়া করে। রমজান আলী হাট সপ্তাহে দুই দিন বসে—বৃহস্পতিবার ও সোমবার। তবে সপ্তাহের অন্য দিনেও দোকানপাট খোলা থাকে। ভারী জিনিসপত্র গ্রামবাসীরা ভ্যানে করে বহন করে। হালকা পণ্য তারা নিজেরাই হাতে করে বহন করে। গ্রামে মাঝে মধ্যে ফেরিওয়ালারা আসে নিত্য-প্রয়োজনীয় পণ্য নিয়ে।

জমির মালিকানা	পরিমাণ	গৃহস্থ
জমির মালিক	৫ বিঘা বা তদোর্ধ্ব	০৭
জমির মালিক	১ বিঘা থেকে ৫ বিঘা	১২
জমির মালিক	১ কাঠা থেকে ১ বিঘা	৩২
ভূমিহীন	০০	৩৯

সারণি-১০ : জমির মালিকানার ভিত্তিতে কদলপুর গ্রামের গৃহস্থদের তথ্য

কদলপুর গ্রামে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের হয় উত্তর-গুজরা প্রাথমিক বিদ্যালয়, নয়তো রমজান আলী হাটের নিকটবর্তী কদলপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে যেতে হয়। ছাত্র-ছাত্রীরা পায়ে হেঁটেই স্কুলে যায়। অন্য সময় অসুবিধা না হলেও বর্ষাকালে ছোট ছেলেমেয়েদের স্কুলে যেতে বেশ কষ্ট হয়। গ্রামের প্রবীণ অধিবাসী শ্রী কানাইলাল চৌধুরী পাঁচ বছর পূর্বে কমিউনিটি বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য ১০ কাঠা জমি দান করেছেন।[৪] কিন্তু কর্তৃপক্ষের যথাযথ উদ্যোগের অভাবে দীর্ঘ পাঁচ বছরেও সে-বিদ্যালয় এখনো প্রতিষ্ঠিত হয় নি। গ্রামীণ যুবকদের অবসর যাপনেরও কোনো সুযোগ নেই কদলপুর গ্রামে। এ গ্রামে খেলার উপযোগী কোনো মাঠ নেই। ফলে সরকারি রাস্তার পাশে মগধেশ্বরী মন্দিরকে কেন্দ্র করেই গ্রামের যুবকেরা একত্র হয়—গাল-গল্প-আড্ডায় সময় কাটায়। তরুণ সংঘের বিভিন্ন সভা এবং কর্মোদ্যোগ যুবকেরা এই মন্দির প্রাঙ্গণে বসেই গ্রহণ করে থাকে। তরুণ সংঘের অন্যতম সংগঠক শ্রী স্বপন সরকার নিজ অর্থে একটি ঘর নির্মাণের কথা আমাকে জানিয়েছেন। যদি এই ঘর নির্মিত হয় তাহলে তরুণ সংঘের কাজে নতুন উদ্দীপনা দেখা দেবে বলে তার ধারণা।[৫]

Dhaka University Institutional Repository

পেশা	গৃহস্থ	শতকরা হার
কৃষিকাজ (ধনী কৃষক)	০৭	৭.৭৮%
কৃষিকাজ (মাঝারি কৃষক)	৩০	৩৩.৩৩%
কৃষি শ্রমিক (ক্ষেত মজুর)	২৪	২৬.৬৭%
চাকুরি (দেশে)	১২	১৩.৩৩%
জেলে, মুচি, নাপিত, ধোপা, ভ্যানচালক ইত্যাদি	১২	১৩.৩৩%
চাকুরি (বিদেশে)	০৫	৫.৫৬%

সারণি -১১ : পেশাগত তথ্য

সাম্প্রতিক সময়ে কদলপুর গ্রামে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার কার্যক্রম প্রসারিত হয়েছে। গ্রামের অনেক দুঃস্থ মহিলা এনজিওদের উৎসাহে একটি সমিতি গঠন করেছে। সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে তারা বিভিন্ন উৎপাদনমুখী কাজে নিয়োগ করে। যথাসময়ে তারা ঋণের টাকা পরিশোধ করে। এভাবে স্থবির গ্রামীণ অর্থনীতিতে সাম্প্রতিক সময়ে বেশ সচলতা পরিলক্ষিত হয়েছে। মাঠ-পর্যায়ে গবেষণা করার সময় আমি লক্ষ করেছি, যারা ঋণ নিয়ে নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়েছেন, তাদের কথাবার্তা ও আচার-আচরণে এক ধরনের সাবলম্বীভাব ফুটে উঠেছে। তাদের দেখে অন্যরাও ঋণ গ্রহণে উৎসাহী হয়ে উঠছে। ঋণের টাকা দিয়ে কদলপুর গ্রামের দুঃস্থ নারীরা হাঁস-মুরগীর খামার, মৎস্য চাষ, বেতের কাজ, মুড়ি ভাজা, মাছ ধরার জাল বোনা—এসব কাজে জড়িত হচ্ছে। তাদের উৎপাদিত পণ্য সাধারণত পার্শ্ববর্তী রমজান আলী হাটে বিক্রি হয়।[৬]

কদলপুর গ্রামে উঁচু কোনো মাঠ বা ঘাসের জমি নেই। ফলে এ গ্রামে গবাদি পশুপালন বেশ কষ্টসাধ্য। আমি লক্ষ করেছি বছরের সারাটা সময় জুড়েই সরকারি রাস্তাতেই গরু-ছাগল বিচরণ করে। বর্ষাকালে গ্রামবাসীদের পক্ষে গরু-ছাগল প্রতিপালন বেশ দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে।[৭]

কদলপুর গ্রামের সামগ্রিক এই পরিচিতির পর এবার দৃষ্টি দেবো আলোচ্য গ্রামের জনগোষ্ঠীর মাঝে ক্রিয়াশীল জাতিবর্ণ ব্যবস্থার উপর। এ গ্রামের হিন্দু জনমানসে যেমন

Dhaka University Institutional Repository

রয়েছে জাতিবর্ণ ব্যবস্থার অমোঘ প্রভাব, তেমনি রয়েছে মুসলিম জনগোষ্ঠীর মাঝেও। জাতিবর্ণ ব্যবস্থার চারিত্র্য, মুসলিম সমাজে তার প্রভাব, আধুনিকতার প্রেক্ষাপটে জাতিবর্ণ ব্যবস্থার পরিবর্তন ও বর্তমান অবস্থা—ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিশদ আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে আলোচ্য অভিসন্দর্ভের পরবর্তী তথা চতুর্থ অধ্যায়ে।

তথ্যনির্দেশ

১. কদলপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ ফারুক হোসেনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ১৯.১২.২০০৬

২. কদলপুর গ্রামের প্রবীণ অধিবাসী শ্রী বীরেন্দ্রলাল দত্ত (সম্প্রতি লোকান্তরিত) জানিয়েছেন যে, ব্রিটিশ আমল থেকে গ্রামের মূল রাস্তাটিকে কেন্দ্র করে মন্দিরের পাশে উত্তরায়ণের মেলা বসে থাকে। মেলায় দূর-দূরান্ত থেকে দোকানি ও ক্রেতারা উপস্থিত হয়। কেনা-বেচা চলে নানা ধরনের খাবার ও লোকপণ্য। সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ১০.০১.২০০৭

৩. এ প্রসঙ্গে ডক্টর এ. কে. নাজমুল করিমের বিশ্লেষণ স্মরণ করা যায়। তিনি লিখেছেন—শ্রেণীহীন সমাজ বলে দাবি করলেও মুসলমান সমাজের মধ্যে উনিশ শতক থেকে আশরাফ ও আতরাফ—এই অদৃশ্য শ্রেণীবিন্যাস চলে আসছে বাংলার মুসলমান সমাজে। বিস্তৃত বিবরণের জন্য দেখুন—A. K. Nazmul Karim, *The Dynamics of Bangladesh Society*, (New Delhi, Vikas Publishing House Pvt. Ltd., 1980), pp. 47-69

৪. শ্রী কানাইলাল চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্য। কানাইলালের সঙ্গে সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ১৯.১১.২০০৮

৫. অপরাহ্ণে মগধেশ্বরী মন্দিরের পাশে প্রশস্ত একটি জায়গায় যুবকদের মিলিত হতে আমি দেখেছি। আন্তরিত যুবকদের কাছে জিজ্ঞাসা করে জানতে পেরেছি, খেলার কোনো মাঠ না থাকার জন্যই তারা রাস্তার পাশে বসে সময় কাটায়। কদলপুর তরুণ সঙ্ঘের স্থায়ী কোনো কার্যালয় না থাকায় রাস্তায় বসেই তারা সভা করে, সঙ্ঘের কার্যাবলি পরিচালনা করে। সঙ্ঘের সভাপতি শ্রী গোবিন্দ সরকার, সাধারণ সম্পাদক শ্রী অজিত তালুকদার এবং সাংগঠনিক সম্পাদক শ্রী স্বপন সরকারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে এসব তথ্য জানা গেছে। শ্রী গোবিন্দ সরকার, শ্রী অজিত তালুকদার এবং শ্রী স্বপন সরকারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্য। সাক্ষাৎকারের তারিখ : ১৮.১২.২০০৮, ২০.১২.২০০৮ এবং ২১.১২.২০০৮।

Dhaka University Institutional Repository

৬. কদলপুর গ্রামের দরিদ্র মহিলারা গঠন করেন 'কদলপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি'। সমিতির সভানেত্রী শ্রীমতী ছবি রানী চৌধুরী এবং সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীমতী মিনতি রানী দে। এক সাক্ষাৎকারে (সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ১১.১২.২০০৮) শ্রী মিনতি রানী দে আমাকে জানিয়েছেন যে, এখন সমিতির সদস্য ৪৯ জন। সমিতির সদস্যরা এককালীন সর্বোচ্চ দশ হাজার টাকা ঋণ নিতে পারেন। সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে অনেকেই আর্থিকভাবে এখন ক্রমশ সাবলম্বী হয়ে উঠছে। গ্রামের দুঃস্থ নারীদের সাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য সমিতি নানা উদ্যোগ নিয়েছে। যারা অক্ষরজ্ঞানহীন তাদের জন্য সমিতি নৈশ বিদ্যালয় পরিচালনা করে। সরকার পাড়ার শ্রী নারায়ণ চন্দ্র সরকারের বাড়িতে প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় নৈশ বিদ্যালয়ে পড়ালেখা চলে। নৈশ বিদ্যালয়ে অবৈতনিক শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন শ্রীমতী সোমা সরকার, শ্রীমতী ছবি রানী চৌধুরী এবং জনাব কাজী শাহ আলম।

৭. শ্রী রতন তালুকদার জানিয়েছেন যে, বর্ষাকালে গরু-ছাগল পালনের মতো কোনো জায়গা নেই কদলপুর গ্রামে। রাস্তা কর্দমাক্ত হয়ে যাওয়ার কারণে গবাদি পশু সেখানে নেওয়া যায় না। গবাদি পশুগুলোকে বসত বাড়িতেই রাখতে হয়। দরিদ্র মানুষের বসত বাড়ির অবস্থা ভালো নয়, ফলে তাদের পক্ষে গবাদি পশু প্রতিপালন দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ১৭. ১২. ২০০৮।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

কদলপুর গ্রামের জাতিবর্ণ ব্যবস্থা

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

কদলপুর গ্রামের জাতিবর্ণ ব্যবস্থা

কদলপুর গ্রামের হিন্দু ও মুসলিম—উভয় ধর্মীয় গোষ্ঠীর মাঝেই মর্যাদাগত বিভাজন লক্ষ করা যায়। এ গ্রামের হিন্দু সমাজ মূলত তিনটি বর্ণে বিভক্ত। এই বর্ণত্রয় হচ্ছে—উচ্চ-বর্ণ, নিম্ন-বর্ণ এবং নমঃশূদ্র। জাতিবর্ণের সনাতন ব্যবস্থা বর্তমানে কিছুটা শিথিল হয়ে পড়লেও জন্ম-বিয়ে-মৃত্যুসহ নানা ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে এখনও এ ব্যবস্থা বিশেষভাবে সক্রিয় আছে। বিশেষত জন্ম, বিয়ে এবং মৃত্যু-উত্তর পারলৌকিক কর্মে জাতিবর্ণের বিধি-বিধান কঠোরভাবে মানা হয়। এই তিনটি সামাজিক প্রপঞ্চসহ আরো কিছু বিষয়ে অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কদলপুর গ্রামের জাতিবর্ণ ব্যবস্থার সামগ্রিক চিত্র বর্তমান অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে।

ব্যাখ্যায় নানামাত্রিক বিভিন্নতা থাকলেও কার্ল মার্কস থেকে আরম্ভ করে ব্যাডেন পাওয়েল, চার্লস মেটক্যাফ, ডি. ডি. কোসাম্বী, এ. আর. দেশাই, ইরফান হাবিবসহ সকল সমাজ-নৃবিজ্ঞানীই প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলার গ্রামকে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম সমাজ (self-sufficient village community) বলে আখ্যায়িত করেছেন।[১] ভারতীয় জাতিবর্ণ ব্যবস্থায় এক একটি পেশাদার সামাজিক গোষ্ঠী এক এক বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করে, জন্মসূত্রেই ওই গোষ্ঠী বিশেষ এক কর্মে নিয়োজিত হয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থায় এটা এক ধরনের সামাজিক শ্রমবিভাগও বটে। বিভিন্ন পেশাদার গোষ্ঠী স্ব-স্ব পেশায় নিয়োজিত থেকে নির্দিষ্ট পণ্য উৎপাদন করে সমাজের চাহিদা পূরণ করে এবং এভাবে সৃষ্টি হয় এক ধরনের স্বয়ংসম্পূর্ণতা। স্বয়ংসম্পূর্ণতা আর বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার ভিত্তিতেই এক সময় পরিচালিত হতো বাংলার গ্রামীণ সমাজ। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণ করা যায় নীহাররঞ্জন রায়ের নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা—

> বাঙলায় ইতিহাসের আদিপর্বে—এবং শুধু আদিপর্বেই নয়, সমস্ত মধ্যযুগ ব্যাপিয়া এবং বহুলাংশে এখনও—বাঙালি জীবন প্রধানত গ্রামকেন্দ্রিক এবং বাঙালির সভ্যতা ও সংস্কৃতি গ্রামীণ।...এই গ্রামকেন্দ্রিকতার প্রধান কারণ আমাদের সামাজিক ধনোৎপাদন পদ্ধতি।...আমাদের প্রধান জীবনোপায়ই ছিল কৃষি এবং ছোট ছোট গৃহশিল্প। কৃষি একান্তই ভূমিনির্ভর। ছোট ছোট গৃহশিল্পে যাঁহারা নিযুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

> থাকিতেন তাঁহারাও প্রধানত না হউন অংশত কৃষকই, এবং তাঁহারাও সেইজন্যই একান্ত ভূমিসংলগ্ন জীবনেই অভ্যস্ত ছিলেন। কৃষিভূমি তো সমস্তই গ্রামে; বস্তুত কৃষিভূমিকে আশ্রয় করিয়াই তো গ্রামগুলি গড়িয়া উঠিত। এই ভূমিই আবার গোষ্ঠী ও পরিবার-বন্ধনের আশ্রয়, অথবা একেবারে উল্টাইয়া বলা চলে, এক এক ভূম্যাংশ আশ্রয় করিয়াই এক একটি গোষ্ঠী ও পরিবার; এবং যেহেতু সেই ভূমি অনড় অচল এবং সেই ভূমিই সকলের জীবিকাশ্রয়, সেই হেতু গোষ্ঠী এবং পরিবারও স্থির এবং গোষ্ঠী পরিবার-বন্ধনও দৃঢ়। তীর্থ পর্যটন, শিক্ষাদীক্ষা আহরণ, ধর্মপ্রচার এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়া গ্রাম ছাড়িয়া বাহিরে যাইবার কোনও প্রয়োজন কাহারও হইত না; জীবিকা সংগ্রহ হইত গ্রামেই, এবং গ্রামগুলি সাধারণত ছিল স্বনির্ভর, স্বয়ংসম্পূর্ণ।[২]

প্রাচীন বাংলার স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম-সমাজ সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানীরা নানাভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সমাজবিজ্ঞানী অনুপম সেনের ভাষ্যে সকল ব্যাখ্যারই একটি স্ফটিকসংহত রূপ প্রকাশ পেয়েছে। স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম-সমাজের চারিত্র্য তিনি নির্দেশ করেছেন এভাবে—"গ্রামের মুখ্য অধিবাসী ছিল কৃষিজীবী ও গ্রামীণ কারিগর শ্রেণী, পাশাপাশি তাদের সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পেশার কিছু লোক যেমন, শিক্ষক, পুরোহিত পণ্ডিত, ঢালী, ঢুলি ইত্যাদি। প্রত্যেক গ্রামেই ছিল নিজস্ব কারিগরশ্রেণী অর্থাৎ কামার-কুমোর, ছুতোর, তাঁতি, নাপিত, ধোপা প্রমুখ। কৃষক-গৃহস্থ ও অন্যান্য গৃহস্থের সারা বৎসরের কারুকর্মের চাহিদা অর্থাৎ প্রয়োজনীয় দা, খন্তা, লাঙল, লাঙলের ফলা, হাঁড়ি, কুড়ি, ঝুড়ি, পরিধেয় বস্ত্র ইত্যাদির প্রয়োজন এরাই মেটাত। প্রতিদানে এরা গ্রাম থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি এবং কৃষকের উৎপাদনের উদ্বৃত্তের অংশবিশেষ পেত। গ্রামগুলোকে নিজের নিত্যদিনের প্রয়োজন মেটাতে সচরাচর বাইরের মুখাপেক্ষী হতে হতো না।"[৩]

স্বনির্ভর স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামসমাজ সৃষ্টিতে জাতিবর্ণ ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কেননা, বিভিন্ন পেশাদার গোষ্ঠী স্ব-স্ব পেশার কাজে নিয়োজিত থেকে সমাজের স্বয়ংসম্পূর্ণতা রক্ষা করতো। কিন্তু এখন আর স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামসমাজের অস্তিত্ব কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এখনো গ্রামে গ্রামে জাতিবর্ণের প্রভাবে বিশেষ একটি গোষ্ঠী বিশেষ কাজ করে থাকে বটে; তবে স্বয়ংসম্পূর্ণতা বলতে যা বুঝায়, তার অস্তিত্ব আজ আর কোনো গ্রামেই বর্তমান নেই। এ প্রসঙ্গেই বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য সমাজবিজ্ঞানী রামকৃষ্ণ মুখার্জীর অভিমত। উত্তরবাংলার খেতলাল উপজেলার অন্তর্গত হাটশহর গ্রামের জাতিবর্ণ ব্যবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে রামকৃষ্ণ লিখেছেন—

Dhaka University Institutional Repository

> ...হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকজন এখানে (হাটশহর গ্রামে) বসবাস করে। নানা বর্ণের হিন্দু লোকজন বসবাস করলেও গ্রামটিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ এলাকা হিসেবে গড়ে তুলতে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ বর্ণের লোকজনের প্রয়োজন, আজকাল আর এমনটি দেখা যায় না। এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ লেখককে জানিয়েছেন সাম্প্রতিক কালে গ্রামটির সমাজকাঠামো দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, এবং বহু পরিবারের উপায়ন্তর না থাকায় ভাগ্যের অন্বেষণে গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র পাড়ি জমাচ্ছে। এ ছাড়াও অনেক পরিবার দরিদ্রতা, রোগ এবং মৃত্যুর কারণে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এবং এসব পরিবারের সাথে সাথে গ্রামটি জন্মগত পেশাদার কিছু সংখ্যক কুমার, কামার ইত্যাদি বর্ণের পরিবারকে হারিয়েছে।[৪]

হাটশহর গ্রাম সম্পর্কে রামকৃষ্ণ মুখার্জীর এই পর্যবেক্ষণ বস্তুত, বাংলাদেশের যে-কোনো গ্রাম সম্পর্কেই প্রযোজ্য বলে মনে হয়। কদলপুর গ্রামেও আমরা একই চিত্র লক্ষ করি। স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামসমাজের বৈশিষ্ট্য কিংবা প্রচল জাতিবর্ণ ব্যবস্থা কদলপুর গ্রামে এখন আর সনাতন রূপে পাওয়া যায় না। ফলে হিন্দুদের বর্ণ-ব্যবস্থাতেও দেখা দিয়েছে নানা ধরনের পরিবর্তন। একেক অঞ্চলে এখন একেক ধরনের বর্ণ-বিভাজন চালু আছে। বর্তমান অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়েই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চতুর্বর্ণের অস্তিত্ব কদলপুর গ্রামে আজ আর নেই। কদলপুর গ্রামে এখন ক্রিয়াশীল বর্ণব্যবস্থাকে আমরা শনাক্ত করতে পারি নিম্নোক্তভাবে—

ক. উচ্চ-বর্ণ (Upper caste);

খ. নিম্ন-বর্ণ (Lower caste);

গ. নমঃশূদ্র (Scheduled caste)।

কদলপুর গ্রামের হিন্দু জনগোষ্ঠীর এই বর্ণব্যবস্থা সম্পর্কে এ অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে বিস্তৃত পর্যবেক্ষণ তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, নিম্নস্তরের এবং সনাতন উৎপাদন ব্যবস্থায় জাতিবর্ণই কখনো কখনো শ্রেণীর মর্যাদা পায়। প্রসঙ্গত সমাজবিজ্ঞানী রংগলাল সেন জানাচ্ছেন—প্রাচীন বাংলায় কায়স্থদের প্রভাব-প্রতিপত্তি এত বেশি ছিল যে, তাদের ক্ষেত্রে বর্ণ ও শ্রেণী সমার্থ হয়ে পড়েছিল।[৫] কদলপুর গ্রামেও বর্তমানে এর কিয়ৎ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা গেছে। তবে যেহেতু আমাদের মূল পর্যবেক্ষণে শ্রেণী-বিষয় প্রতিপাদ্য ছিল না, তাই সে-বিষয়ে কোনো ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়নি। এ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে মুসলিম সমাজে জাতিবর্ণ ব্যবস্থার প্রভাব ও তার স্বরূপ ব্যাখ্যা করা

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। হিন্দুদের জাতিবর্ণ ব্যবস্থার অদৃশ্য প্রভাব কদলপুর গ্রামের মুসলিম জনগোষ্ঠীর মাঝেও ক্রিয়াশীল আছে বলে আমাদের পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে পাওয়া যাবে নানামাত্রিক কারণে জাতিবর্ণ ব্যবস্থায় এ কালে যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে সে-সম্পর্কে বিশদ আলোচনা। উল্লেখ করা প্রয়োজন, বৌদ্ধদের মাঝে সামাজিক মর্যাদা-বিভাজনের কোনো লক্ষণ নেই। কদলপুর গ্রামেও যে দুই বৌদ্ধ পরিবার বাস করে তাদের মাঝে, কিংবা পার্শ্ববর্তী অন্য গ্রামের বৌদ্ধদের মাঝে কোনো সামাজিক বিভাজনের কথা জানা যায় নি।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

হিন্দু সমাজে জাতিবর্ণ ব্যবস্থা

কদলপুর গ্রামের শতকরা ৯০ ভাগ মানুষই হিন্দু ধর্মাবলম্বী। পূর্বেই ব্যক্ত হয়েছে যে, কদলপুর গ্রামের হিন্দুদের মাঝে এখন তিন বর্ণের মানুষ বাস করছে। এরা হচ্ছে উচ্চ-বর্ণ, নিম্ন-বর্ণ এবং নমঃশূদ্র। এই তিনবর্ণ সম্পর্কে বিস্তৃত পর্যবেক্ষণ ও ব্যাখ্যা এবার আমরা ক্রমানুযায়ী উপস্থাপনের প্রয়াস পাব।

উচ্চ-বর্ণ (Upper Caste)

উচ্চ-বর্ণের হিন্দু সামাজিক স্তরবিন্যাস এবং বর্ণব্যবস্থা—উভয় দৃষ্টিকোণেই মর্যাদার শীর্ষে অবস্থান করে। উচ্চ-বর্ণের মাঝে স্পষ্টরেখায় দুটো বিভাজন রয়েছে। এই বিভাজনদ্বয় এ-রকম—১. ব্রাহ্মণ (Brahmans) এবং ২. অন্যান্য উচ্চ-বর্ণ (Other upper-casts) সামাজিক স্তরবিন্যাসের দৃষ্টিকোণে কদলপুর গ্রামের ব্রাহ্মণরা মর্যাদার শীর্ষে অবস্থান করে। অন্যান্য উচ্চ-বর্ণের মানুষ মর্যাদার দৃষ্টিকোণে ব্রাহ্মণদের চেয়ে নিজেদের নিম্ন-মর্যাদাসম্পন্ন বলে মনে করে। উল্লেখ্য, উচ্চবর্ণভুক্ত ব্রাহ্মণরা অন্যান্য উচ্চ-বর্ণের বাড়িতে যায়, জল পান করেন—কিন্তু অন্ন স্পর্শ করেন না। অন্যান্য উচ্চ-বর্ণের মানুষ ব্রাহ্মণদের ঘরে উঠতে পারে, এবং ব্রাহ্মণ প্রদত্ত যে-কোন খাবার গ্রহণ করতে পারে। ব্রাহ্মণ কিংবা অন্যান্য উচ্চ-বর্ণের মাঝেও আবার নানামাত্রিক বিভাজন আমাদের পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে।

১. ব্রাহ্মণ (Brahmins)

কদলপুর গ্রামে ব্রাহ্মণ পরিবারের সংখ্যা মোট চার। এই চার ব্রাহ্মণ পরিবারে মোট জনসংখ্যা ২১ জন। কদলপুর গ্রামের বর্ণ ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণরা সামাজিক মর্যাদার শীর্ষে অবস্থান করেন। ব্রাহ্মণরা অন্যান্য উচ্চ-বর্ণ এবং নিম্ন-বর্ণের হিন্দুদের বাড়িতে পূজা-অর্চনা করে, তাদের শোনায় ধর্মীয় কথা। অন্যান্য উচ্চ-বর্ণ কিংবা নিম্ন-বর্ণের হিন্দুদের বাড়িতে গেলেও তাদের দেওয়া কোনো খাবার ব্রাহ্মণরা গ্রহণ করে না। বিয়ে, শ্রাদ্ধ বা অন্য কোনো সামাজিক উৎসবে কোনো উচ্চ-বর্ণ বা নিম্ন-বর্ণের হিন্দুর বাড়িতে ব্রাহ্মণেরা নিমন্ত্রিত হলে, তাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা থাকে। একটি স্বতন্ত্র ঘরে রান্নার উপকরণ ও

Dhaka University Institutional Repository

সামগ্রী দেওয়া হয়। ব্রাহ্মণ পরিবারের কোনো সদস্য রান্না করে এবং এক সঙ্গে আহার করে। খাদ্য-প্রস্তুতি এবং আহারের সময় ব্রাহ্মণরা অন্যান্য উচ্চ-বর্ণের কিংবা নিম্ন-বর্ণের হিন্দুদের স্পর্শ এড়িয়ে চলে। জাতিবর্ণ ব্যবস্থায় শাস্ত্রীয় পবিত্রতা-অপবিত্রতার ধারণায় (ritual pollution and purity) খাদ্যপ্রস্তুতি এবং আহার একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। ব্রাহ্মণরাও মনে করে, খাদ্যপ্রস্তুতি ও আহার গ্রহণ কালে ব্রাহ্মণ জাতি-বহির্ভূত অন্য কোনো ব্যক্তির স্পর্শ লাগলে অপবিত্রতার দোষে আক্রান্ত হবে ওই ব্রাহ্মণ। আহার গ্রহণ-বিষয়ক বর্ণ-ব্যবস্থার এই বৈশিষ্ট্য কদলপুর গ্রামেও লক্ষ করা গেছে।

কদলপুর গ্রামের সরকার পাড়ায় শ্রী নারায়চন্দ্র সরকার বাটিস্থ মাতৃমণ্ডপে মহা ধুমধামের সঙ্গে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজার সময় আমি সেখানে উপস্থিত থেকে বর্ণ-ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণের চেষ্টা করেছি। লক্ষ করেছি, ব্রাহ্মণরা খাদ্যপ্রস্তুতি এবং আহার গ্রহণে সনাতন প্রথাই অনুসরণ করছে। তারা স্বতন্ত্র ঘরে রান্না করে, তাদের হাতে প্রস্তুত অর্ঘ্য দেবীক উৎসর্গ করা হয়, তারা নিজেরাও সে-রান্না সামগ্রী আহার করে। আমি লক্ষ করেছি, অন্যান্য উচ্চ-বর্ণ বা নিম্ন-বর্ণের হিন্দুরা ব্রাহ্মণদের তৈরি আহার সামগ্রীকে পবিত্র প্রসাদ হিসেবে গ্রহণ করে। ব্রাহ্মণের হাতে তৈরী আহারকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে 'ভোগ' বলা হয়। 'ভোগ' আহারকালে উচ্চ-বর্ণ বা নিম্ন-বর্ণের হিন্দুরা প্রথমেই কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম করে নেয়। যে-সব শিশু এখনো মাতৃদুগ্ধ ছাড়া অন্য কোনো আহারে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি, তাদেরও কপালে বা মাথায় ঠেকিয়ে 'ভোগ' গ্রহণ করে পরিবারের বয়স্ক কোনো সদস্য। 'ভোগ' গ্রহণের পর জল দিয়ে ভালোভাবে হাত পরিষ্কার করা হয়, যেন অন্য কোনো আহারের স্পর্শে তা অপবিত্র না হয়।[৬]

কদলপুর গ্রামে যে চার পরিবার ব্রাহ্মণ আছে, মর্যাদাগত দৃষ্টিকোণে তারা আবার দু'ভাগে বিভক্ত। সনাতন বর্ণ-ব্যবস্থায় প্রতিটি বর্ণের মাঝেই আবার কতগুলো জাতি (caste) থাকে। কদলপুর গ্রামে ব্রাহ্মণদের মাঝেও তা লক্ষ করা যায়। চার পরিবার ব্রাহ্মণের মধ্যে এক ঘর ব্রাহ্মণ উচ্চ-মর্যাদাসম্পন্ন, অন্যদিকে বাকি তিন ঘর নিম্ন-মর্যাদাভুক্ত। উচ্চ-মর্যাদার ব্রাহ্মণ পরিবারের পদবী চক্রবর্তী, অন্যদিকে নিম্ন-মর্যাদাভুক্ত তিন ব্রাহ্মণ পরিবারের পদবী আচার্য। আচার্যদের কদলপুর অঞ্চলে মাশ্রাধী ব্রাহ্মণ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। চক্রবর্তী পদবীধারী ব্রাহ্মণ পরিবারের প্রধান ব্যক্তি হচ্ছেন শ্রী আশুতোষ চক্রবর্তী। তার ছেলের নাম কানাইলাল চক্রবর্তী। এই দুই ব্রাহ্মণই কদলপুর গ্রামের অন্যান্য উচ্চ-বর্ণের হিন্দুদের বাড়ির যাবতীয় পূজা-অর্চনা, বিয়ে, জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদি উপলক্ষে কৃত্য বিধানসমূহ সমাধা করে থাকে। মাশ্রাধী ব্রাহ্মণরা অন্যান্য উচ্চ-

Dhaka University Institutional Repository

বর্ণের হিন্দুদের বাড়িতে পূজা-অর্চনা করে না, কিংবা কোনো কৃত্যমূলক কাজে পৌরহিত্যও করে না। মাশ্রাধী ব্রাহ্মণেরা নিম্ন-বর্ণের হিন্দুদের বাড়িতে যজমানী করে, অংশগ্রহণ করে নানা কৃত্য অনুষ্ঠানে। ব্রাহ্মণদের মাঝে মর্যাদাগত এই বিভাজন যুগের পর যুগ চলে আসছে কদলপুর গ্রামে।

কদলপুর গ্রামে ক্ষেত্রানুসন্ধান কালে আমি লক্ষ করেছি, অন্যান্য উচ্চ-বর্ণের হিন্দুর বাড়িতে দুর্গাপূজাসহ নানা কৃত্যমূলক কাজে চক্রবর্তী পদবীধারী ব্রাহ্মণের সাহায্যকারী হিসেবে মাশ্রাধী ব্রাহ্মণরা নানা কাজ করে। পূজার উপকরণ সাজানো, ফুল সংগ্রহ করা, ঘাট থেকে জল আনা, প্রদীপ জ্বালানো—এসব কাজ মাশ্রাধী ব্রাহ্মণরাই করে থাকে। উচ্চ-বর্ণের হিন্দুদের বাড়িতে পূজা বা বিয়ের অনুষ্ঠানে মাশ্রাধী ব্রাহ্মণরা মন্ত্র পাঠ করতে পারেন না। আবার তারাই নিম্ন-বর্ণের হিন্দুদের বাড়িতে পূজার সময় মন্ত্র উচ্চারণ করে, বিয়ের মন্ত্র পাঠ করে। সামাজিক দৃষ্টিকোণেও চক্রবর্তী ব্রাহ্মণদের অবস্থান মাশ্রাধী ব্রাহ্মণের চেয়ে অনেক উঁচুতে।

সামাজিক মর্যাদাগত এই বিভাজন ব্রাহ্মণ পরিবারদের নানা কাজেও লক্ষ করা যায়। চক্রবর্তী পদবীধারী ব্রাহ্মণ আচার্য ব্রাহ্মণদের বাড়িতে আহার গ্রহণ করলেও, এই দুই মর্যাদার ব্রাহ্মণ পরিবারে বিবাহপ্রথার প্রচলন নেই। বিয়ের বর বা কনের জন্য তারা অন্য গ্রামের ব্রাহ্মণ পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে। অন্য জাতি বা বর্ণের কারো সঙ্গে ব্রাহ্মণের বিয়ে সমাজে প্রবলভাবে নিন্দনীয়। এরূপ ঘটনা ঘটলে তা পাপ বলে গণ্য হয় এবং তাতে ওই পরিবার অপবিত্র বা polluted হলো বলে ধারণা করা হয়। প্রায় দশ বছর পূর্বে এই গ্রামের মাশ্রাধী পরিবারের এক যুবক চট্টগ্রাম শহরে পড়ালেখা করতে গিয়েছিল। সেখানে সে সহপাঠী নিম্ন-বর্ণের এক হিন্দু মেয়ের সঙ্গে প্রণয় সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। অনেক চেষ্টা করেও ছেলেটি, নাম যার বিপুল, ওই মেয়েকে সামাজিকভাবে বিয়ে করতে পারে নি। তবে শহরে গিয়ে বিপুল যখন তার প্রেমিকাকে বিয়ে করে সমাজে তা ভয়াবহ পাপ বলে বিবেচিত হয়। বিপুলকে সমাজে একঘরে করা হয়। শেষ পর্যন্ত পরিবার-বন্ধন ছিন্ন করে তাকে চট্টগ্রাম শহরে চলে যেতে হয়। এখন সে চট্টগ্রাম শহরেই থাকে এবং এক সদাগরি ফার্মে কাজ করে স্ত্রীকে নিয়ে বিড়ম্বিত জীবন যাপন করে।[৭] কদাচিৎ সে মা-বাবাকে দেখার জন্য গ্রামে আসে। সাধারণত সন্ধ্যার পরে বাড়ি আসে, আবার অতি ভোরে গ্রাম ছেড়ে চলে যায়। গ্রামে এলে পরিবারের সদস্য ছাড়া আর কারো সঙ্গে দেখা করে না, কথা বলে না। বিপুল আচার্যের সঙ্গে কথা বলার জন্য আমি সাধ্যমত অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু শত চেষ্টাতেও তার

Dhaka University Institutional Repository

সাক্ষাৎ পাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। কদলপুর গ্রামে জাতিবর্ণের শাসন কোনো কোনো ক্ষেত্রে এখনো যে কত দৃঢ়, বিপুল আচার্যের এই পরিণতি তার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বিয়ের ক্ষেত্রেই জাতিবর্ণ ব্যবস্থা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সম্প্রতি এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ভারতে অন্য বর্ণের তরুণ-তরুণীর প্রণয়ের ফলে বিয়ের ক্ষেত্রে সামাজিক অস্বীকৃতির কারণে বছরে এক হাজারেরও অধিক যুবক-যুবতী মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে বাধ্য হয়।[৮] নৃবিজ্ঞানী Veena Das-এর অভিমত এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। উত্তর-ভারতের ধর্মারণ্য নামক গ্রামের ব্রাহ্মণদের জাতপাতের শাসন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন—

> Manu and other authors who had codified the religious laws had permitted the acceptance of wives from the lower *Varnas*. However, in the kaliyuga the Brahmans were not to be permitted to aceept wives from the lower *Varnas*. These new rules which restricted the acceptance of food and wives from other *jatis* were to be strictly followed by the residents of Dharmaranya.[৯]

সমাজে এইকথা সবাই বিশ্বাস করে যে, ব্রাহ্মণরা কোনো পাপ করতে পারে না। যদিবা তারা কোনো পাপ করে, সেক্ষেত্রে আছে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা। প্রায়শ্চিত্ত পালন করলেই ব্রাহ্মণ পাপমুক্ত হতে পারে। তবে প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে পাপমুক্তির এই বিধান অন্যান্য উচ্চ-বর্ণ বা নিম্ন-বর্ণ হিন্দুর মধ্যে পাওয়া যায় না। উল্লেখ করা যায়, জাতিবর্ণের এই বিধান সমাজে চালু করেছে ব্রাহ্মণরা, তাই নিজেদের স্বার্থ যাতে অক্ষুণ্ন থাকে, সে-দিকে তারা বিশেষভাবে লক্ষ রেখেছে। প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে পাপমুক্তির বিধান সেই স্বার্থচেতনারই এক অভ্রান্ত প্রমাণ। তবে নানা ক্ষেত্রে প্রায়শ্চিত্ত সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন বিধান চালু আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় Veena Das-এর অভিমত—

> If a Brahman committed a murder, then he was to perform the requisite act of penance in accordance with the procedures laid down in the Dharmashastras. If a Brahman, a woman, a child or a cow had been killed, then a *Vrata* for the duration of twelve years would have to be performed. Drinking liquor was to be regarded as sinful as killing and accordingly punished.[১০]

Dhaka University Institutional Repository

কদলপুর গ্রামের চক্রবর্তী ব্রাহ্মণদের বিয়ে বা অন্য কোনো ধর্মীয় কাজে ব্রাহ্মণের প্রয়োজন দেখা দিলে অন্য গ্রামের উচ্চ-মর্যাদার ব্রাহ্মণদের আমন্ত্রণ করে আনা হয়। মর্যাদাগত স্তরায়ণে আচার্য ব্রাহ্মণরা চক্রবর্তী ব্রাহ্মণদের নীচে থাকায়, তারা কোনো কৃত্যে অংশগ্রহণ করতে পারে না। উচ্চ-মর্যাদার ব্রাহ্মণই কেবল উচ্চ-মর্যাদার ব্রাহ্মণের বাড়িতে কৃত্যমূলক ধর্মীয় কাজে মন্ত্র পাঠ ও মন্ত্র উচ্চারণ করতে পারে এই-ই হচ্ছে চক্রবর্তী পদবীধারীদের দীর্ঘকালীন বিশ্বাস। আচার্য ব্রাহ্মণরা পূজার কাজ তত্ত্বধান করতে পারে, সাজিয়ে দিতে পারে অর্ঘ্যও, কিন্তু পূজা করার কোনো অধিকার তাদের নেই। মৃত্যু-উত্তর শ্রাদ্ধের কাজ করার ক্ষেত্রে তারা পালন করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। নাম শুনানো, ব্রাহ্মকর্ম প্রতিপালন ইত্যাদি করেই তাদের জীবিকা পরিচালিত হয়। ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং বিয়েতে নানা বর্ণের লোক অংশগ্রহণ করে, ব্রাহ্মণদের তারা দেবতার প্রতিনিধি হিসেবে জ্ঞান করে। তবে লক্ষ করা গেছে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য বর্ণের হিন্দুরা মাশ্রাধী ব্রাহ্মণের তুলনায় চক্রবর্তী ব্রাহ্মণকেই বেশি মর্যাদা দিয়ে থাকে।

কদলপুর গ্রামের ব্রাহ্মণ পরিবার চতুষ্টয় পৌরহিত্য করেই জীবন নির্বাহ করে। তবে মাশ্রাধী পরিবারের একজন ব্রাহ্মণ গ্রামের ছোট ছেলে-মেয়েদের অক্ষরজ্ঞান শিক্ষা দিয়ে কিছু উপার্জন করে। চক্রবর্তী পরিবারের আশুতোষ চক্রবর্তীর কিছু ধানের জমি আছে, তা দিয়ে তিনি কৃষি-শস্য লাভ করেন। এক নমঃশূদ্র বর্গাচাষীর কাছে তিনি জমি দিয়ে দেন চাষের জন্য । বিনিময়ে উৎপাদিত শস্যের অর্ধেকটা তিনি লাভ করেন। অর্থনৈতিক অসহায়তার কারণে মাশ্রাধী পরিবারের নির্মল আচার্য রমজান আলী হাটে তরি-তরকারি বিক্রি করে। পূর্বে এ কাজকে গ্রামের লোকেরা ভালো চোখে দেখে নি, কিন্তু ক্রমে সকলেই তা মেনে নিয়েছে। ব্রাহ্মণ পরিবারের সদস্যরা পূজার বিধি-বিধান ভালোভাবে জানে, মন্ত্র উচ্চারণ করতে পারে। অতীতে এ গ্রামে আরো বেশ কিছু ব্রাহ্মণ পরিবার ছিল। কিন্তু নানা কারণে তারা অন্যত্র চলে গেছে। অতীতে আমল থেকেই দেখা গেছে, ব্রাহ্মণ পরিবারের ছোট ছেলে-মেয়েরা অন্য বর্ণের হিন্দুদের সঙ্গে এক স্কুলে পড়ালেখা করতো না। বাড়িতে মা-বাবার কাছেই তারা শিক্ষা লাভ করতো। কিন্তু এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। এখন ব্রাহ্মণ পরিবারের একাধিক সদস্য নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে অন্য শিক্ষার্থীর সঙ্গে লেখাপড়া করছে।

ব্রাহ্মণ পরিবারের পুরুষ সদস্য উপনয়ন (পৈতা পরানো) উৎসবের মাধ্যমে প্রকৃত ব্রাহ্মণ হিসেবে ধর্মীয় সমাজজীবনে প্রবেশ করে। উপনয়নকে ব্রাহ্মণের জীবনে দ্বিতীয় জন্ম হিসেবে অভিহিত করা হয়। বর্ণপ্রথা কীভাবে একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্কিত, তা

Dhaka University Institutional Repository

উপনয়ন অনুষ্ঠান থেকে অনুধাবন করা যায়। যে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একজন মানুষ প্রকৃত ব্রাহ্মণ হয়ে ওঠেন, তা নির্ভর করে অপেক্ষাকৃত নিচু বর্ণের নাপিত কর্তৃক তার মস্তকমুণ্ডনের মাধ্যমে। মাথার চুল ন্যাড়া করে দিয়ে নাপিত ওই ব্রাহ্মণকে পবিত্র করে তোলে। হাটশহর গ্রামে ব্রাহ্মণসমাজে উপনয়ন অনুষ্ঠানেও সমাজবিজ্ঞানী রামকৃষ্ণ মুখার্জী একই চিত্র লক্ষ করেছেন। তিনি লিখেছেন—

> এই উৎসব (উপনয়ন অনুষ্ঠান) পালন করার সময় নাপিত দিয়ে তার (ব্রাহ্মণের) চুল ন্যাড়া করে দেয়া হয় এবং সে সাথে কান ছিদ্র করে সোনার অথবা রুপার রিং পরানো হয়। পরবর্তীতে তাকে গেরুয়া রং-এর ধুতি-চাঁদর দিয়ে সন্ন্যাসীর পোষাক পরানো হয়। তাকে অন্ততঃ পক্ষে এক বছরের জন্য কুমার এবং ব্রহ্মচারীর ন্যায় কঠোর জীবন অনুশীলন করার অঙ্গীকার করতে হয়।...এই উৎসব পরিচালনার জন্য পুরোহিত এবং কান ছিদ্র ও মাথা ন্যাড়া করার জন্য নাপিতদেরকে প্রণামী এবং উৎসবে যে সব আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবরা অংশগ্রহণ করে তাদের জন্য ভোজের ব্যবস্থা করা হয়।[১১]

মৃত্যুর পর মরদেহ দাহের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে কদলপুর গ্রামের ব্রাহ্মণরা। এক্ষেত্রে চক্রবর্তী বা আচার্য—উভয় জাতিই অভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করে। মৃত ব্যক্তির নিকট আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবগণ মরদেহটি বাঁশের মাচা বা চার পা বিশিষ্ট কাঠের চৌকিতে করে পাড়াস্থ পুকুরের পাশে নিয়ে যায়। সেখানেই মরদেহটি আম কাঠ দিয়ে দাহ করা হয়। দাহের সময় কোনো এক পর্যায়ে এক টুকরা চন্দন কাঠও আগুনে দেওয়া হয়। ভাবা হয় মৃত ব্যক্তি চন্দন কাঠের গন্ধ পেয়ে প্রফুল্লিত হবে। দাহ করার পর উপস্থিত সবাই পুকুরে স্নান করে। এরপর মৃত ব্যক্তির পরিবারের পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে চিড়া ও গুড় দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। দাহ করার এগার বা তের দিন পর অপবিত্রতা কাটানোর লক্ষে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই এগার দিন মৃত ব্যক্তির ঘরে রান্না হয় না; তাদের গৃহে কেউ জল বা কোনো খাবার গ্রহণ করে না। যে ব্রাহ্মণ পরিবারের সদস্য মারা যান, সে-পরিবারের কোনো ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে পারেন না। অন্য পরিবারের কোনো ব্রাহ্মণ এ দায়িত্ব পালন করেন। কদলপুর গ্রামে উচ্চ-মর্যাদার যে এক পরিবার ব্রাহ্মণ আছে, তাদের পারলৌকিক কাজে এজন্য অন্য স্থান থেকে উচ্চ-মর্যাদার ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করে আনতে হয়। নিমন্ত্রিত ওই ব্রাহ্মণকে বিধান অনুযায়ী শ্রাদ্ধের উপহারসহ প্রণামী দিতে হয়। শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ ব্যতীত কেবল অন্যান্য উচ্চ-বর্ণের হিন্দুদের নিমন্ত্রণ করা হয়। ব্রাহ্মণের কোনো ধর্মীয় অথবা সামাজিক অনুষ্ঠানে নিম্ন-বর্ণের হিন্দু অথবা নমঃশূদ্রদের নিমন্ত্রণ করা হয় না। কদলপুর গ্রামে এ ব্যবস্থা যুগের পর যুগ চলে আসছে।

Dhaka University Institutional Repository

২. অন্যান্য উচ্চ-বর্ণ (Other Upper Castes)

কদলপুর গ্রামে অন্যান্য উচ্চ-বর্ণের হিন্দু আছে মোট পঁচিশ পরিবার এবং তাদের সংখ্যা ১২২ জন, যা গ্রামের জনসংখ্যার শতকরা ২৯.৪০ ভাগ। অন্যান্য উচ্চ-বর্ণের হিন্দুদের মধ্যে আছে সরকার, চৌধুরী, দত্ত, দে এবং তালুকদার পদবীধারী মানুষ। অন্যান্য উচ্চ-বর্ণের হিন্দুরাই কদলপুর গ্রামের সামাজিক কর্মকাণ্ডসমূহ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। কদলপুর গ্রামে পাঁচ পদবীধারী উচ্চ-বর্ণের মধ্যে সরকারদের অবস্থান শীর্ষে। অভিন্ন বর্ণের মাঝেও যে নানামাত্রিক বিভাজন আছে, আছে নানা জাতির অস্তিত্ব কদলপুর গ্রামের অন্যান্য উচ্চ-বর্ণের মাঝে তা বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে, কদলপুর গ্রামের উচ্চ-বর্ণের মধ্যে মর্যাদাগত বিভাজনের অনুক্রমটা এরকম — সরকার, চৌধুরী, দত্ত, দে এবং তালুকদার।[১২]

কদলপুর গ্রামের অন্যান্য উচ্চ-বর্ণের হিন্দুদের মধ্যে আন্তঃবিবাহ ও আন্তঃআহার চালু রয়েছে। সামাজিকভাবে অন্য বর্ণের নর-নারীর সঙ্গে উচ্চ-বর্ণের নর-নারীর বিয়ে নিষিদ্ধ। কঠোরভাবে এ বিধান পালন করা হয়। অন্যান্য উচ্চ-বর্ণের কোনো যুবক বা যুবতী নিম্ন-বর্ণের কাউকে বিয়ে করলে সমাজে গর্হিত কাজ বলে বিবেচিত হয়। তবে মজার বিষয় হলো অন্যান্য উচ্চ-বর্ণের কোনো নর-নারী ব্রাহ্মণ পরিবারের কাউকে বিয়ে করলে সামাজিকভাবে তা প্রশংসার চোখে দেখা হয়। গ্রামে এটিকে সামাজিকভাবে উচ্চ-অবস্থানে পৌঁছে যাওয়ার সমাজতাত্ত্বিক প্রপঞ্চ হিসেবেই বিবেচনা করা হয়। সমাজবিজ্ঞানী এম. এন. শ্রীনিবাস কথিত 'সংস্কৃতায়ন' প্রত্যয়টিকে এ গ্রামে এভাবে ক্রিয়াশীল দেখতে পাওয়া যায়। প্রায় দুই যুগ পূর্বে কদলপুর গ্রামের একটি ঘটনার কথা আমি তথ্যসংগ্রহকালে জেনেছি। গ্রামের চৌধুরী পদবীধারী এক যুবক পার্শ্ববর্তী আন্ধারমানিক গ্রামের এক ব্রাহ্মণকন্যাকে ভালোবেসে বিয়ে করে। গ্রামের হিন্দু জনগোষ্ঠী এ ঘটনায় প্রথমে খানিকটা অস্বস্তিতে থাকলেও, অচিরেই ঘটনাটিকে গর্বের চোখে দেখেছে। অন্য বর্ণের হিন্দুদের উপর ব্রাহ্মণদের স্বেচ্ছাচার এবং অত্যাচারই হয়তো তাদের চিত্তে এই ঘটনা এক ধরনের প্রসন্নতা ছড়িয়েছে।[১৩]

অন্যান্য উচ্চ-বর্ণের হিন্দুদের বিয়ের সময় জাতিবর্ণের বিধি-বিধানকে কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয়। মর্যাদাসম্পন্ন পরিবারে বিয়ে দেওয়ার জন্য গ্রামের সকল সদস্যই উদগ্রীব। কিন্তু সব সময় মর্যাদাসম্পন্ন পাত্র বা পাত্রী পাওয়া যায় না। বিয়ের সময় বর বা কন্যার বংশমর্যাদা গভীরভাবে দেখা হয়। এ এলাকায় একটি প্রবাদ ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে, যে প্রবাদ থেকে সামাজিক মর্যাদার নিয়ামক হিসেবে বংশ-মর্যাদা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া সম্ভব। প্রচলিত প্রবাদটি এরকম — 'জাতের মেয়ে

Dhaka University Institutional Repository

কালোও ভালো / নদীর জল ঘোলাও আলো।' এ প্রবাদ যে বংশমর্যাদার দিকে ইঙ্গিত করছে, তা লেখাই বাহুল্য।

বিয়ের মন্ত্র পাঠ করেন চক্রবর্তী ব্রাহ্মণ। কদলপুর গ্রামের উচ্চ-বর্ণের প্রায় সকলেই আকাঙ্ক্ষা করেন তার পুত্র বা কন্যার বিয়েতে পুরোহিত হিসেবে শ্রী আশুতোষ চক্রবর্তী উপস্থিত থাকুন। এক লগ্নে একাধিক বিয়ে অনুষ্ঠিত হলে এখন কানাইলাল চক্রবর্তীও পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করে। পিতা আশুতোষ চক্রবর্তীর মতো কানাইলালও আস্তে আস্তে কদলপুরের হিন্দু জনগোষ্ঠীর কাছে জনপ্রিয় ও শ্রদ্ধেয় হয়ে উঠছে। বিয়ের অনুষ্ঠানে সমস্ত উপকরণ সাজিয়ে দেন কন্যাপক্ষের কোনো একজন নারী। বিয়ের দিন কন্যার মতো তিনিও উপবাস ব্রত পালন করেন। বিয়ের পিঁড়ি এবং আসর তিনি আলপনা এঁকে অলঙ্কৃত করেন, সাজিয়ে দেন সমস্ত উপকরণ। তবে যজ্ঞের সমস্ত কাজ করেন একজন মাশ্রাধী ব্রাহ্মণ। যজ্ঞানুষ্ঠানের কোনো কিছু ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কেউ স্পর্শ করতে পারে না। কেননা যজ্ঞের সামনেই থাকে নারায়ণের মূর্তি। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কারো নারায়ণের মূর্তি স্পর্শ করা মহা পাপকর্ম—এই ধারণা উচ্চ-বর্ণ নিম্ন-বর্ণসহ সকল হিন্দুর মাঝেই আমি লক্ষ করেছি।

পাত্রীর বাড়িতেই উচ্চ-বর্ণের হিন্দুর বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। বিয়ের দিন লগ্নের পূর্বেই বরযাত্রীসহ পাত্র বিয়েব আসরে উপস্থিত হয়। বরপক্ষেও কখনো কখনো একজন ব্রাহ্মণ থাকে। তিনিও বিয়ের অনুষ্ঠানে পাত্রীপক্ষের ব্রাহ্মণকে সাহায্য করে থাকেন। তবে কখনো কখনো দুই ব্রাহ্মণের মধ্যে কৃত্যের নানা বিষয় নিয়ে মতভেদও আমি লক্ষ করেছি। বরপক্ষের ব্রাহ্মণকে পাত্রীপক্ষের সবাই ভক্তিভরে গ্রহণ করে। তার জন্য থাকা-খাওয়ার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা হয়। তবে রীতি অনুযায়ী পাত্রপক্ষের ব্রাহ্মণকে স্বহস্তে রান্না করে খেতে হয়।

উচ্চ-বর্ণের হিন্দুর বাড়িতে অন্নপ্রাশন[৪] উৎসব পালিত হয়। এ উৎসবও পরিচালনা করেন শ্রী আশুতোষ চক্রবর্তী। অন্নপ্রাশন উৎসবে বিভিন্ন বর্ণের লোককে নিমন্ত্রণ করা হয়। তবে শিশুটির মুখে কেবল দেবতার 'ভোগ' দেওয়া হয়। আশুতোষ চক্রবর্তীই গ্রামের সকল শিশুর মুখে প্রথম অন্ন তুলে দেন। উচ্চ-বর্ণের হিন্দুদের মাঝে শিশুর লেখাপড়ার আরম্ভ-বিষয়ক হাতেখড়ি অনুষ্ঠান হয়। আশুতোষ চক্রবর্তীকে দিয়েই সকলে হাতেখড়ি দিতে চায় তার সন্তানকে। আশুতোষ চক্রবর্তী নিজে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন। কিন্তু তাতে কিছু আসে-যায় না। যেহেতু তিনি ব্রাহ্মণ, দেবতার মর্ত্য প্রতিনিধি—তাই সকলের বিশ্বাস তার মাধ্যমে পড়ালেখা আরম্ভ হলে শিশুটি

Dhaka University Institutional Repository

উত্তরকালে উচ্চশিক্ষিত হবে, বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে। বর্তমানে অন্নপ্রাশন বা হাতেখড়ি অনুষ্ঠান উঠে গেছে বললেই চলে। অর্থনৈতিক সঙ্কটই এর প্রধান কারণ। তবে এ ধরনের অনুষ্ঠান পুনরায় চালু হওয়া উচিত বলে মনে করেন শ্রী আশুতোষ চক্রবর্তী। তিনি জানালেন, অতীতে এসব অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য তিনি ভালো প্রণামী পেতেন, কিন্তু এখন তা অনেক হ্রাস পেয়েছে।[১৫] বোঝা যায়, তার এই অভিমতের পিছনে কাজ করছে অর্থনৈতিক চিন্তা।

শিশু জন্মের পর 'কোষ্ঠী'[১৬] তৈরির বিধান কদলপুর গ্রামের উচ্চ-বর্ণের হিন্দুদের মাঝে বিশেষভাবে লক্ষ করা গেছে। কোষ্ঠীতে শিশুর যাবতীয় তথ্য লিপিবদ্ধ থাকে। মঙ্গল-অমঙ্গলের নানা ইঙ্গিত কোষ্ঠীতে লেখা হয়। ব্রাহ্মণ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত এই কোষ্ঠী অতি যত্নের সঙ্গে সংরক্ষণ করা হয়। উত্তরকালে নানা কাজে, বিশেষত বিয়ের সময় এই কোষ্ঠী খুবই জরুরি হয়ে পড়ে। সাধারণত আশুতোষ চক্রবর্তীই শিশুদের কোষ্ঠী তৈরি করে থাকেন। তবে মাশ্রাধী ব্রাহ্মণরাও এ কাজ করে থাকেন। আশুতোষ চক্রবর্তীকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করায় তিনি জানান—কোষ্ঠীর সঙ্গে দেবতা বা ধর্মের তেমন সম্পর্ক নেই। তাই মাশ্রাধী ব্রাহ্মণরা এ কাজ করতে পারবে বলে তার পূর্ব-পুরুষেরাই অনুমতি দিয়ে গেছেন।[১৭]

উচ্চ-বর্ণের কোন হিন্দুর মরদেহ সৎকারে ব্রাহ্মণের অংশগ্রহণ অবশ্যম্ভাবী। মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তি ও মুক্তির জন্য পরলৌকিক কর্ম পরিচালনা করেন উচ্চ-মর্যাদার ব্রাহ্মণ। তবে ইদানিং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আচার্য ব্রাহ্মণও এ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। বাঁশের মাচায় করে মরদেহ খাল অথবা পুকুর পাড়ে নির্দিষ্ট স্থানে নেওয়া হয়। বাড়ি থেকে মরদেহ নেওয়ার সময় পথে খই ছিটানো হয় এবং ছোট পিতলের কলসিতে রাখা জল আমের পল্লব দিয়ে মরদেহ বাহকদের গায়ে ছিটানো হয়, ছিটানো হয় শবযাত্রায় অংশগ্রহণকারী অন্য ব্যক্তিদের গায়েও। মরদেহ আম কাঠ দিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হয়। যখন মরদেহ দাহ করা হয়, তখন সমবেত কণ্ঠে পৌনঃপুনিক 'হরিবোল' 'হরিবোল' ধ্বনি উচ্চারণ করা হয়। মরদেহ দাহের সময় চিতায় এক টুকরা চন্দন কাঠ দেওয়া হয়। ভাবা হয়, চন্দন কাঠের গন্ধ মৃত ব্যক্তিকে প্রফুল্লিত রাখবে। মৃত ব্যক্তির দাহ সম্পন্ন হলে সকলে পুকুরে স্নান করে বাড়ি ফেরে এবং চিড়া-দই আহার করে। মরদেহ দাহে অংশগ্রহণকারী কেউ-ই পরিধেয় বস্ত্রসহ ঘরে প্রবেশ করে না। স্নান সেরে নতুন বস্ত্র পরিধান করে ঘরে ফেরাই শাস্ত্রীয় বিধান।

Dhaka University Institutional Repository

মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধ[১৮] অনুষ্ঠান হয় ১১ বা ১৩ দিন পর। কখনো ৩০ দিন পরেও শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। অতীতে ৩০ দিনে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের নিয়ম ছিল। কিন্তু এখন তা ১১ বা ১৩ দিনে কমে এসেছে। শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের পূর্ব পর্যন্ত পরিবারের লোকদের কঠিন 'গুরুদশা' বা ব্রহ্মচর্য পালন এবং সময়-ধারণার কারণে শ্রাদ্ধের দিন কমে এসেছে। শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের পূর্ব পর্যন্ত পলান্ন ভোজন করতে হয় পরিবারের সদস্যদের। খাবারে কোনো লবণ দেওয়া যায় না। কেবল নারিকেল পাতা পুড়িয়ে রান্না করতে হয়। রান্না হয় মাটির হাড়ি-পাতিলে, ভাত খেতে হয় কলাপাতায়। এ সময় পরিবারের সদস্যরা সেলাই করা বস্ত্র পরিধান করে না। পরিবারের পুরুষ সদস্যরা হাতে কুশাসন নিয়ে খালি পায়ে চলাফেরা করে। কোথাও বসতে হলে কুশাসনের উপর বসে। পরিবারের বিবাহিতা সদস্যরা চুল আঁচড়ায় না, সধবা নারী কপালে সিঁদুর পরে না। মৃত ব্যক্তির স্ত্রী থাকলে, তার হাতের শাঁখা মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে খুলে ফেলা হয়, এবং সকল প্রসাধন তিনি বর্জন করেন। শ্রাদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত তাকে সাদা বস্ত্র পরিধান করতে হয়। এ সময় পরিবারের সদস্যরা চুল কাটে না, পুরুষ সদস্যরা ক্ষৌরকর্ম করে না। শ্রাদ্ধের দিন পারলৌকিক কর্ম সমাপ্ত হলে পুকুরে স্নান করে এসে তারা 'শুদ্ধ' হয় এবং স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরে আসে। পর্যবেক্ষণকালে আমি লক্ষ করেছি, কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর পরিবারের সদস্যরা উপরের নিয়মগুলো কঠোরভাবে পালন করে থাকে।

জাতিবর্ণ প্রথায় এক বর্ণের মানুষ অন্য বর্ণের মানুষের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। মৃতদেহ সৎকার এবং শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান থেকেও তার ধারণা পাওয়া যায়। সমাজে প্রামাণিক বা নাপিতদের অবস্থান নিম্ন-বর্ণে, মর্যাদায়ও তারা তুচ্ছ। কিন্তু বিয়ে বা অন্নপ্রাশন, জন্ম বা মৃত্যু—সর্বত্রই তাদের অংশগ্রহণ অনিবার্য। মৃত্যুর পরে নির্দিষ্ট দিনে মৃতব্যক্তির পরিবারের সদস্যদের নখ কেটে এবং পুরুষ সদস্যদের মস্তক মুণ্ডন করে দেয় নাপিত। শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের পূর্বে পুকুরে স্নান করার পূর্বে নাপিতই পরিবারের সদস্যদের 'শুদ্ধ' করে দেয়। যাদের শুদ্ধ করে দেওয়া হয়, তাদের পরিধেয় বস্ত্র নাপিত গ্রহণ করে।

মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে সামর্থ্য অনুযায়ী গ্রামবাসীদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো হয়। অন্যত্র বসবাসরত আত্মীয়-স্বজনদেরও নিমন্ত্রণ করা হয়। মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠানে নিরামিষ অন্ন পরিবেশন করা হয়। মরদেহ সৎকারে যারা অংশগ্রহণ করেছিল, তাদের সকলকে নিমন্ত্রণ করা অবশ্যম্ভাবী। শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য কদলপুর তরুণ সঙ্ঘের সদস্যরা সব সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে

Dhaka University Institutional Repository

ব্রাহ্মণ বা নমঃশূদ্র নিমন্ত্রিত হলে তাদের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করতে হয়। ব্রাহ্মণের আহার ব্রাহ্মণকেই নিজ হাতে তৈরি করতে হয় পৃথক একটি ঘরে। সেখানেই তারা আহার করে। অন্যদিকে নমঃশূদ্র ব্যক্তিরা একই আহার গ্রহণ করে, তবে তাদের বসতে দেওয়া হয় পৃথক একটি স্থানে। তবে ইদানিং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা উঠে গেছে।[১৯] এখন উচ্চ-বর্ণ, নিম্ন-বর্ণ এবং নমঃশূদ্র হিন্দুরা একই ঘরে বসে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আহার গ্রহণ করে থাকে। আমি লক্ষ করেছি, বেশ কিছু অনুষ্ঠানে এ ব্যাপারে সামাজিক বিভাজন মানা হয় নি।

উচ্চ-বর্ণের হিন্দুরা বাড়িতে ধুতি-গেঞ্জি বা লুঙ্গি-গেঞ্জি পরিধান করে। তবে বাজারে বা গ্রামের বাইরে যাবার সময় তারা ধুতি-শার্ট , ধুতি-পাঞ্জাবী, লুঙ্গি-শার্ট, বা প্যান্ট-শার্ট পরে থাকে। অতীতে পুরুষ সদস্যরা অবশ্যই ধুতি পরে বাইরে যেত, কিন্তু ইদানিং ধুতির পরিবর্তে অধিকাংশই প্যান্ট পরিধান করে। উচ্চ-বর্ণের নারীরা বাড়ি এবং বাড়ির বাইরে সর্বত্রই শাড়ি-ব্লাউজ পরিধান করে, অল্প-বয়সী মেয়েরা পরে সালোয়ার-কামিজ।

উচ্চ-বর্ণের হিন্দুরা নিজেদের মধ্যে কথা বলার সময় চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করে। তবে তারা প্রমিত বাংলাও বলতে পারে। নিম্ন-বর্ণের হিন্দুদের ক্ষেত্রেও একই কথা সত্য। তবে নমঃশূদ্ররা প্রমিত বাংলা বলতে পারে না। তারা সব সময়ই চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করে। প্রমিত ভাষা ব্যবহারে নমঃশূদ্রদের এই অক্ষমতা বাংলাদেশের সর্বত্রই লক্ষ করা যায়। ঢাকা জেলার মেহেরপুর গ্রামের নমঃশূদ্রদের ভাষা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে সমাজ-নৃবিজ্ঞানী আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী লিখেছেন— "The upper caste Hindus can speak in standard Bengali, which is not possible for the scheduled caste."[২০]

উচ্চ-বর্ণের হিন্দু নারীরা গৃহস্থালী কাজ করে। সাধারণত তারা গ্রামের বাইরে গিয়ে কোনো কাজ করে না। তবে ইদানিং কিছু তরুণী বাইরে গিয়ে চাকরি করছে। গ্রামের অধিকাংশ গৃহবধূই ঘরকন্নার কাজে নিজেদের ব্যস্ত রাখে। যারা সামান্য পড়ালেখা শিখেছে, তারা সন্তান-সন্ততির পড়ালেখায় সাহায্য করে থাকে। গৃহবধূরা স্বর্ণালঙ্কার পরিধান করে, সধবারা সিঁথি এবং কপালে সিঁদুর পরে। বাড়িতে পরিবার ভিন্ন কোনো পুরুষ এলে অবশ্যই তারা মাথায় ঘোমটা দেয়। স্বামীর বড় ভাই অর্থাৎ ভাসুরের সামনেও তারা সব সময় ঘোমটা দিয়ে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

উচ্চ-বর্ণের সরকার বংশের পাঁচজন যুবক পশ্চিম এশিয়ায় নির্মাণ-শ্রমিক হিসেবে চাকুরি করে। গ্রামের অধিকাংশই জানে, তারা ভালো চাকুরি করে, কিন্তু তাদের একজনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার সূত্রে আমি জানতে পারি তারা নির্মাণ-শ্রমিক হিসেবে চাকুরি করে। পশ্চিম এশিয়ায় চাকুরি করার ফলে এই পাঁচ পরিবারের সামাজিক মর্যাদাও অনেকটা বেড়ে গেছে। মনে হয়, তাদের অবস্থান ব্রাহ্মণের মতো ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

নিম্ন-বর্ণ (Lower Caste)

কদলপুর গ্রামে নিম্ন-বর্ণের হিন্দু পরিবারের সংখ্যা মোট ৪৪। এই ৪৪ পরিবারে নিম্ন-বর্ণের হিন্দুর মোট সদস্য সংখ্যা ২২০ জন। নিম্ন-বর্ণের হিন্দুর মধ্যে আছে দাস ২৭ পরিবার, ভূঁই মালী ০৭ পরিবার, প্রামাণিক ০২ পরিবার, রজকদাস ০১ পরিবার এবং বণিক ০৭ পরিবার। কদলপুর গ্রামের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৩ ভাগ মানুষ নিম্ন-বর্ণের হিন্দু। উচ্চ-বর্ণের হিন্দুদের তুলনায় নিম্ন-বর্ণের হিন্দুরা সামাজিক-অর্থনৈতিকভাবে বেশ পিছিয়ে পড়া। মর্যাদার দিক থেকে উচ্চ-বর্ণের হিন্দুদের পরে তাদের অবস্থান হলেও, ধর্মীয় কৃত্য ও সামাজিক বিধি-বিধানের দৃষ্টিকোণে তারা ব্রাহ্মণভিন্ন অন্যান্য উচ্চ-বর্ণের হিন্দুদের কাছাকাছি। জন্ম, অন্নপ্রাশন, বিয়ে, মৃত্যু-উত্তর পারলৌকিক কর্ম—এসব ক্ষেত্রে তারা অন্যান্য উচ্চ-বর্ণের হিন্দুদের অনুরূপ বিধান পালন করে থাকে।[১১]

নিম্ন-বর্ণের হিন্দুদের নানা ধর্মীয় কাজে, অন্নপ্রাশনে, বিয়েতে, মরদেহ সৎকারে উচ্চ-মর্যাদার ব্রাহ্মণের পাশাপাশি আচার্য ব্রাহ্মণও অংশগ্রহণ করেন। আচার্য ব্রাহ্মণরা উচ্চ-বর্ণের হিন্দুদের কোনো অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে পারে না, কিন্তু নিম্ন-বর্ণের হিন্দুদের যাবতীয় কাজ তারা করতে পারে। মর্যাদার দিক থেকে আচার্য ব্রাহ্মণ এবং নিম্ন-বর্ণের হিন্দুরা নিচে আছে বলেই এমনটা হয়েছে বলে মনে করা হয়।

উচ্চ-বর্ণের হিন্দুদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, বিভিন্ন পদবীধারীর মধ্যে আন্তঃবিবাহ সমাজে স্বীকৃত। কিন্তু নিম্ন-বর্ণের হিন্দুদের ক্ষেত্রে এটা একেবারেই উল্টো। নিম্ন-বর্ণের হিন্দুদের মধ্যে অন্য বংশের সঙ্গে বিয়ে সমাজ-অস্বীকৃত। ফলে ভূঁইমালীর সঙ্গে ভূঁইমালী, প্রামাণিকের সঙ্গে প্রামাণিক, রজকদাসের সঙ্গে রজকদাস এবং বণিকের সঙ্গে বণিকের বিয়ে হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে অবশ্য ব্যতিক্রম দাস বংশ। দাস বংশের ছেলে-মেয়ের মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

বিয়ে ছাড়াও উচ্চ-বর্ণের ছেলে-মেয়ের সঙ্গে দাস বংশের ছেলে-মেয়ের বিয়ে সমাজে স্বীকৃত। যদিও এ বিয়েকে অনেকে ভালো চোখে দেখে না। তবে অতীত আমল থেকেই এ নিয়ম চলে আসছে। কেবল কদলপুর গ্রামেই নয়, বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই সামাজিক মর্যাদায় দাসরা পিছিয়ে থাকলেও, উচ্চ-বর্ণের হিন্দুর সঙ্গে দাস-বংশোদ্ভূত ছেলে-মেয়ের বিয়ে সমাজে স্বীকৃতি পেয়ে আসছে।

বিয়ের আসরে যেসব কৃত্য পালিত হয়, সে-ক্ষেত্রে উচ্চ-বর্ণের হিন্দুর সঙ্গে নিম্ন-বর্ণের হিন্দুদের তেমন কোনো পার্থক্য আমাদের নজরে পড়েনি। কেবল একটি পার্থক্যের কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। উচ্চ-বর্ণের হিন্দুদের বিয়েতে বিয়ের রাতে স্বামী-স্ত্রী পৃথক সজ্জায় ঘুমায়; কিন্তু নিম্ন-বর্ণের হিন্দুদের ক্ষেত্রে তারা এক সজ্জায় ঘুমায়। বিয়ের পরের রাতে স্বামী-স্ত্রী কেউ কারো মুখ দর্শন করে না—এ প্রথা উচ্চ-বর্ণ নিম্ন-বর্ণ উভয় হিন্দুদের ক্ষেত্রেই সত্য।

নিম্ন-বর্ণের হিন্দুরা অন্যান্য উচ্চ-বর্ণের হিন্দুদের ঘরে খেতে পারে, তাদের রান্নাঘরে যেতে পারে। উচ্চ-বর্ণের হিন্দুরাও নিম্ন-বর্ণের হিন্দুদের বাড়িতে আহার গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে ধর্মীয় কোনো নিষেধ নেই। কদলপুর গ্রামে দেখা গেছে নিম্ন-বর্ণের দরিদ্র এক নারী উচ্চ-বর্ণের এক পরিবারে অর্থের বিনিময়ে রান্না করে দেয়। সামাজিক বিধি-নিষেধ না থাকার দরুনই এমনটা সম্ভব হয়েছে।

নিম্ন-বর্ণের হিন্দুদের অনেকেই এমন কাজ করে, যা উচ্চ-বর্ণের ক্ষেত্রে কল্পনাও করা যায় না। দু'জন নিম্ন-বর্ণের মানুষ মাছ ধরে ও তা বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। তিন জন অন্যের জমি বর্গা-চাষ করে। পার্শ্ববর্তী রমজান আলী হাটে তরি-তরকারি বিক্রি করে একাধিক নিম্ন-বর্ণের হিন্দু। নিম্ন-বর্ণের এক হিন্দু যুবক উপায়ন্তর না দেখে ভ্যান গাড়ি চালায়। প্রথমে সে অন্যত্র গাড়ি চালাতো, কিন্তু এখন আর সে নিজেকে লুকিয়ে রাখে না। গ্রামের সবার সামনেই সে ভ্যান গাড়ি চালায়। দাস পরিবারের এক কিশোর বাজারে আইসক্রিম বিক্রি করে, ভূঁইমালী বংশোদ্ভূত এক যুবক কদলপুর হাটে ঔষধের দোকানে বিক্রেতার চাকুরি করে।

যে দুই পরিবার প্রামাণিক আছে, সেখানে বয়স্ক পুরুষের সংখ্যা চার জন। চারজনই ক্ষৌরকর্ম করে জীবিকা নির্বাহ করে। নেপাল সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ প্রামাণিক। বাড়ি বাড়ি গিয়ে ক্ষৌরকর্ম করে নেপাল। শিশুদের মাথা ন্যাড়া করা, মৃত্যুর পর শুদ্ধি কাজ করা,

Dhaka University Institutional Repository

পূজার সময় প্রয়োজনীয় কাজ করা—এসব ক্ষেত্রে নেপালের জুড়ি মেলা ভার। সকলেই চায়, এসব কাজ নেপাল করুক। কিন্তু কখনো কখনো তার একার পক্ষে সব কাজ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। সে-সময় তাকে সাহায্য করে পুত্র সুবল। সুবলও এখন পিতার মতো এসব কাজে দক্ষ হয়ে উঠেছে। সেও বাড়ি বাড়ি গিয়ে ক্ষৌরকর্ম করে, কখনো ভিন্ন গ্রামেও চলে যায়। প্রামাণিক বংশের রাম প্রামাণিক ও যদু প্রামাণিক দুই ভাই। তারা রজমান আলী হাটে ক্ষৌরকর্ম করে। প্রতিদিন সকালে তারা হাটে গিয়ে অস্থায়ী সেলুনে বসে, মানুষের চুল কাটে, দাড়ি কামায়।

সামাজিক মর্যাদায় প্রামাণিকরা নিচুতে অবস্থান করলেও তাদের ভূমিকা ছাড়া উচ্চ-বর্ণের অথবা নিম্ন-বর্ণের কোনো হিন্দুরই ধর্মীয় বা সামাজিক কাজ শুদ্ধ হয় না। তাই অন্য নিম্ন-বর্ণের তুলনায় প্রামাণিকদের অবস্থা খানিকটা উঁচুতে। এ কারণে সকলের কাছেই তাদের গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। তারা উচ্চ-বর্ণের বাড়িতে যায়, রান্না ঘরে প্রবেশ করে, এমনকি তাদের দেওয়া খাবার উচ্চ-বর্ণের হিন্দুরা গ্রহণ করে। তবে ব্রাহ্মণরা প্রামাণিকসহ কোনো নিম্ন-বর্ণের দেওয়া খাবারই গ্রহণ করে না।

কদলপুর গ্রামে মাত্র এক ঘর রজকদাস বা ধোপার বাস। এই পরিবারে বয়স্ক পুরুষ আছে একজনই, নাম তার অধীর রজকদাস। অধীর রজকদাস জামা-কাপড় কেচে ও ইস্ত্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। বাড়িতে জামা-কাপড় কাচার বিশেষ ব্যবস্থা করে নিয়েছে অধীর। কোনো কোনো পারলৌকিক কাজে ধোপার প্রয়োজন হয়। এটা উচ্চ-বর্ণের হিন্দু, নিম্ন-বর্ণের হিন্দু, এমন কি নমঃশূদ্র হিন্দুদের বেলায়ও সত্য। প্রামাণিকদেরও প্রয়োজন হয় নমঃশূদ্রদের পারলৌকিক কাজে। দেখা গেছে, নমঃশূদ্রদের মধ্যে প্রামাণিক বা রজকদাস না থাকায় নিম্নবর্ণের প্রামাণিক ও রজকদাসদের দিয়েই তাদের কাজ চালাতে হয়। এক্ষেত্রে বর্ণগত ভিন্নতার কথা কেউ কখনো বলে না। এ ব্যাপারে শ্রী আশুতোষ চক্রবর্তীকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানান—ধর্মীয়ভাবে এটা হয়তো ঠিক নয়, কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে তা চলে আসছে। তার মতে অর্থনৈতিক কারণেই হয়তো নিম্ন-বর্ণের প্রামাণিক বা রজকদাস নমঃশূদ্র পাড়ায় গিয়ে কিছু পারলৌকিক কাজ করে থাকে।[২২]

উচ্চ-বর্ণের হিন্দুদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, পরিবারের কেউ মারা গেলে ৩০ দিন পরে শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। ইদানিং কেউ কেউ ১১ বা ১৩ দিনেও শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করে। কিন্তু নিম্ন-বর্ণের হিন্দুদের মধ্যে ৩০ দিনে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের কোনো বিধান নেই। সকলেই

Dhaka University Institutional Repository

হয় ১১, নয়তো ১৩ দিনে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করে থাকে। শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে উচ্চ-বর্ণের হিন্দু এবং নমঃশূদ্রদের নিমন্ত্রণ করা হয়। দেখা গেছে, উচ্চ-বর্ণের এবং নিম্ন-বর্ণের হিন্দু একাসনে বসে আহার করলেও, নমঃশূদ্ররা ভিন্ন স্থানে উপবেশন করেছে। এমনকি পরিবেশনকারীও আলাদা। যে ব্যক্তি উচ্চ-বর্ণের হিন্দু বা নিম্ন-বর্ণের হিন্দুর আসরে খাবার পরিবেশন করে, সে কখনোই নমঃশূদ্রদের খাবার দিতে যায় না। এটা জাতিবর্ণের কুফল বলেই অনেকে মনে করে।

প্রায় চার যুগ পূর্বে 'দাস' পরিবারের এক সদস্য নিজের পদবী রাতারাতি বদলিয়ে তালুকদার পদবী গ্রহণ করে। প্রথমে গ্রামের কেউ এটা গ্রহণ করে নি। কিন্তু ক্রমে সবাই তার পরিবারকে মেনে নিয়েছে। সেই ব্যক্তি মারা গেলেও তার বংশধররা এখন তালুকদার পদবীতে পরিচিত এবং তারা উঠে গেছে উচ্চ-বর্ণের স্তরে। এভাবে কদলপুর গ্রামে শ্রীনিবাস-উচ্চারিত 'সংস্কৃতায়ন' প্রত্যয়ের উপস্থিতিও আমরা প্রত্যক্ষ করি।

নমঃশূদ্র (Scheduled Caste)

কদলপুর গ্রামে মোট ৮ পরিবার নমঃশূদ্র হিন্দুর বাস। এই ৮ পরিবারে মোট ৫২ জন সদস্য রয়েছে, যা গ্রামের মোট জনসংখ্যার শতকরা ১২.৫৩ ভাগ। নমঃশূদ্ররা সামাজিক মর্যাদার সবচেয়ে নিচে অবস্থান করে। উচ্চ-বর্ণের বা নিম্ন-বর্ণের হিন্দুর তুলনায় জন্ম, বিয়ে বা মৃত্যু-উত্তর পারলৌকিক কাজে নমঃশূদ্রদের মাঝে কিছু কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়েছে।

নমঃশূদ্র পুরুষ নানা ধরনের কাজ করে, যে-সব কাজ সমাজে সম্মানিত বলে মনে করা হয় না। এরা কৃষিকাজ করে, বাজারে মাছ বিক্রি করে, শামুক দিয়ে চুন তৈরি করে, রিক্সা ও ভ্যান চালায়, ঘর তৈরি করে, পানের বরজে পান চাষ করে। নমঃশূদ্র পাড়ার ছোট ছেলে-মেয়েরা পড়ালেখায় মোটেই উৎসাহী নয়। অভিভাবকেরাও এ দিকে তেমন একটা নজর দিতে চায় না। কিশোর বয়সেই তাদের কাজে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের আশায়। অধিকাংশ নমঃশূদ্রই আর্থিকভাবে খুব দুর্বল। এজন্য তাদের খাবারের অবস্থা ভালো নয়, পোষাক-পরিচ্ছদও অতি সাধারণ। বাড়িতে পুরুষেরা ধুতি পরে থাকে, কাজেও যায় ধুতি পরে, শরীরের উপরের অংশে কিছু নাই বললেই চলে। পরিবারের নারী সদস্যরা নানা রকম কাজ করে আর্থিক অসহায়তা কাটানোর চেষ্টা করে। দু'জন গৃহবধূ উচ্চ-বর্ণের দুই হিন্দুর বাড়িতে ঘর-বাড়ি পরিষ্কার করে, রান্নার কাঠ

Dhaka University Institutional Repository

সরবরাহ করে, থালা-বাসন ধুয়ে দেয়। নমঃশূদ্র পরিবারের নারী সদস্যরা অল্প দামের শাড়ি পরিধান করে।

নমঃশূদ্রদের মধ্যে আন্তঃবিবাহ ও আন্তঃআহার চালু রয়েছে। অন্য বর্ণের কারো সঙ্গে বিয়ে নিষিদ্ধ। তবে কোনো নমঃশূদ্র যদি উচ্চ-বর্ণ বা নিম্ন-বর্ণের কোনো পুরুষ বা নারীকে বিয়ে করে, সমাজে সেটা গর্বের সঙ্গে দেখা হয়। বিয়ের সময় বর কনের বাড়িতে এলে প্রথমেই বরের পা জল দিয়ে ধোয়ানো হয়; তারপর কনে তার মাথার চুল দিয়ে বরের পা মুছে দেয়। উচ্চ-বর্ণ বা নিম্ন-বর্ণের হিন্দুদের মতো বিয়ের পরের রাতে স্বামী-স্ত্রীর মুখদর্শন না করার বিধান নমঃশূদ্রদের মাঝেও প্রচলিত আছে।

আমি যে তিন পর্যায়ে কদলপুর গ্রামে ক্ষেত্রানুসন্ধানের কাজ সমাধা করেছি, সে-সময়ে কোনো নমঃশূদ্রের মৃত্যু হয় নি। ফলে মৃত্যু-উত্তর পারলৌকিক কর্ম নমঃশূদ্ররা কীভাবে পালন করে, আমার পক্ষে তা পর্যবেক্ষণের সুযোগ হয় নি। তবে বয়োজ্যেষ্ঠ নমঃশূদ্র হারাধন মণ্ডলের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে যা জেনেছি, তা উচ্চ-বর্ণের হিন্দুদের অনুরূপ বলে মনে হয়েছে। নমঃশূদ্ররাও আমকাঠ দিয়ে মরদেহ পোড়ায়, দাহশেষে সকলে পুকুরে স্নান করে বাড়ি ফেরে, পরিধেয় বস্ত্র ধুয়ে নেয়।[২৫]

নমঃশূদ্ররা ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য বর্ণের হিন্দুদের বাড়িতে যেতে পারে। তবে তাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা থাকে। উচ্চ-বর্ণের হিন্দুর বাড়িতে পূজা-পার্বণে তারা অংশগ্রহণ করে, তবে মন্দিরে উঠতে পারে না। তাদের দেওয়া অন্ন উচ্চ-বর্ণের বা নিম্ন-বর্ণের হিন্দুরা গ্রহণ করে না। তবে জল, ফল এবং মিষ্টিদ্রব্য তারা গ্রহণ করে। একই ধরনের বিধান সমাজ-নৃবিজ্ঞানী আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী লক্ষ করেছেন ঢাকা জেলার মেহেরপুর গ্রামে। তিনি লিখেছেন—

> The members of the upper caste take food in lower caste families if they are invited by them on the occasion of marriage, annaprasanna (name-giving ceremony of Hindu children), and such other ceremonies. But they do not take food in scheduled caste families on such occasions. They take only sweets and water. The scheduled castes arranges sweets for the upper castes on such occasions. Separate sitting arrangement is made for the upper castes.[২৬]

Dhaka University Institutional Repository

তবে বর্তমানে নানামাত্রিক পরিবর্তনের ফলে নমঃশূদ্রদের মাঝে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে, পরিবর্তন দেখা দিয়েছে উচ্চ-বর্ণের হিন্দু কিংবা নিম্ন-বর্ণের হিন্দুদের মাঝেও। খাবার-দাবারের বাধা-নিষেধ এখন প্রায় উঠে গেছে। বিশেষত তরুণসমাজ এখন আর এসব বাধা মানে না। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় নমঃশূদ্র বর্ণ বিষয়ে বিখ্যাত গবেষক সমাজবিজ্ঞানী K. S. Singh-এর ভাষ্য। *The Scheduled Caste* শীর্ষক গ্রন্থে তিনি লিখেছেন—

> At present there are no restrictions on accepting or exchanging water and food with nighbouring communities. They can visit the same religious places, share sources of water, and also take part in festivals along with other communities. Cultivator-labour relationships, commercial links with other communities, and also modern intercommunity linkages, are forged and perpetuated.[19]

অনেক নমঃশূদ্র পরিবারের পূর্বপুরুষের জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপায় ছিল শিকার। এখন শিকারবৃত্তি উঠে গেছে। পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেড়ে গেছে, সৃষ্টি হয়েছে নতুন নতুন পরিবার। কিন্তু বসতবাটির পরিমাণ অভিন্ন রয়েছে। ফলে দারিদ্র্যের মধ্যে অনেক নমঃশূদ্রকে মানবেতর জীবন যাপন করতে হচ্ছে।

কদলপুর গ্রামের হিন্দুদের মাঝে ক্রিয়াশীল জাতিবর্ণ ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ শেষে এইকথা বলা যায় যে, এখনো এই গ্রামে জাতিবর্ণের শাসন অনেকাংশে অক্ষুণ্ণ রয়েছে। তবে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো সনাতন ধারণার জাতিবর্ণ ব্যবস্থা কদলপুর গ্রামেও আজ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। নানা মাত্রিক পরিবর্তনের ফলে জাতিবর্ণ ব্যবস্থাও আজ বিচিত্রভাবে রূপান্তরিত হচ্ছে, গ্রহণ করছে নতুন নতুন রূপ।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মুসলিম সমাজের সামাজিক স্তরবিন্যাস ও জাতিবর্ণ ব্যবস্থার প্রভাব

কদলপুর গ্রামে মোট সাত পরিবার মুসলিমের বাস—এই সাত পরিবার মিলে মুসলিম জনসংখ্যা ৪১ জন, যা গ্রামের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮.৮২ ভাগ। সাত পরিবার মুসলিমের মধ্যে কাজী বংশোদ্ভূত দুই পরিবার মুসলিম অভিজাত বা খান্দান মর্যাদার; বাকি পাঁচ পরিবার মুসলিম মোল্লা বংশোদ্ভূত নিম্নস্তরের তথা দিনমজুর। নিম্নস্তরের বা আতরাফ মর্যাদার দিনমজুরকে কদলপুর গ্রামে গৃহস্থ নামে আখ্যায়িত করা হয়। ধর্মীয় বিধান অনুসারে মুসলিম সমাজে হিন্দুদের অনুরূপ জাতিবর্ণ ব্যবস্থার প্রচলন নেই। তবে পাশাপাশি অবস্থানের কারণে হিন্দু জাতিবর্ণ ব্যবস্থার প্রভাব পড়েছে মুসলিম সমাজের উপর। কোনো মুসলিমকে বলা হয় আশরাফ বা খান্দান; আবার কাউকে বলা হয় আতরাফ বা গৃহস্থ। বস্তুত এই বিভাজনের মাঝেই লুকিয়ে আছে হিন্দুধর্মের অদৃশ্য জাতিবর্ণ ব্যবস্থার ছায়া। এ প্রসঙ্গে সমাজবিজ্ঞানী এ. কে. নাজমুল করিমের বিশ্লেষণ প্রণিধানযোগ্য। *The Dynamics of Bangladesh Society* গ্রন্থে তিনি লিখেছেন—

> It is difficult to determine the nature of social stratification among the Bengali Muslims during the nineteenth century. The traditional 'fanciful' fourfold classification of the muslim society in imitation of the four main Hindu caste divisions does not descibe the character of the Muslim social structure. ...In Bangal, on conversion to Islam from the Hindu social order most of the converts assumed the title Sheikh, and others (who migrated to Bangal from outside or were converted earlier) according to convenience and their economic and social status, began to claim to be Syeds, Mughals or Pathans. ...It seems that if we classify the Bengali Muslims of the nieteenth century into : (i) *Ashraf* or *Sharif*, and (2) *Atraf* or *Ajlaf* we would possibly get a better pictuer of the nature of social stratification among them. Generally speaking, the *Ashraf* or the landed gentry claimed noble ancestry, while the *Atraf*, or the toiling masses and peasant proprietors could not lay any such claim to noble ancestry.[১১]

Dhaka University Institutional Repository

কোনো কোনো সমাজবিজ্ঞানী উল্লেখ করেছেন মুসলিম সামাজিক স্তরবিন্যাস হিন্দুর চতুর্বর্ণ ব্যবস্থার অনুসরণেই সৃষ্টি হয়েছে। এ প্রসঙ্গে J. D. Cunningham-এর অভিমত উল্লেখ করা যায়। তিনি লিখেছেন—"The Mohometans of India fancifully divided themselves into four classes, after the manner of the Hindus, viz. Syeds, Shekhs, Moghuls, and Puthans."[২৭] William Crooke-ও অবশ্য মুসলিমদের সামাজিক স্তরবিন্যাসকে হিন্দুদের চতুর্বর্ণ ব্যবস্থার অনুসরণ বলেই বিবেচনা করেছেন। Crooke-এর মতে—"In fact, to such an extent does the Hindu idea of a fourfold social division prevail, that is : Brahman, Kshatriya, Vaishya and Sudra, that in some parts of the country converts to Islam consider that they are bound to enrol themselves as either Sayyid, Shaykh, Mughal, or Pathan."[২৮] তবে সকলেই এ মত স্বীকার করেন নি। অনেক সমাজ-নৃবিজ্ঞানীই বলেছেন যে, মুসলিম সামাজিক স্তরবিন্যাস হিন্দু বর্ণাশ্রমের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। মুসলিমদের মধ্যে বংশানুক্রমিক কোনো পেশা নির্ধারিত নেই। ধন-সম্পদের অধিকারী হলেই যে-কেউ সামাজিকভাবে মর্যাদাসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে। মুসলিমদের মধ্যে সামাজিক সচলতার (Social Mobility) ধারা হিন্দুদের থেকে ভিন্নতর। মুসলিমদের মধ্যে ব্যক্তিগত সামাজিক সচলতার প্রচলন রয়েছে এবং এখানে নেই শুচি-অশুচি বা পবিত্রতা-অপবিত্রতার (Purity and Pollution) প্রশ্ন। এসব কারণে অনেক সমাজবিজ্ঞানীই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, মুসলিমদের সামাজিক স্তরবিন্যাস হিন্দুদের জাতিবর্ণ ব্যবস্থার অনুরূপ নয়; বরং তা স্বতন্ত্রভাবে বিকশিত হয়েছে।[২৯]

কদলপুর গ্রামের কাজী বংশের মুসলিমরা অভিজাত খান্দানী মুসলিম। পার্শ্ববর্তী মোল্লাদের সঙ্গে আন্তঃআহার থাকলেও দুই বংশের মধ্যে আন্তঃবিবাহ চলে না। কাজীরা বর না কনে সংগ্রহ করেন অন্য অঞ্চল থেকে। জনাব কাজী শাহ আলমকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন—"ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছি আমরা খান্দান আর মোল্লারা নিচু জাতের। ওদের সঙ্গে আমাদের বিয়ে হয় না। তবে অন্যসব সামাজিক অনুষ্ঠানে কোনো পার্থক্য নেই যেমন আহার, মৃত ব্যক্তিকে সমাধিস্থ করা, মসজিদে একসঙ্গে নামাজ আদায় করা ইত্যাদি।"[৩০]

Dhaka University Institutional Repository

কাজী বংশের মুসলিমরা শিক্ষিত এবং ভূ-সম্পত্তির মালিক। কাজী শাহ আলম স্নাতক পাস করে গ্রামেই বাস করেছেন। জমিজমার আয় থেকেই তিনি জীবিকা নির্বাহ করেন। কাজী শাহ আলমের ভাই কাজী দিদারুল আলম এম. এ. পাস করে চট্টগ্রাম শহরে চাকরি করেন। তিনি মাঝে মাঝে গ্রামে আসেন, তবে স্থায়ীভাবে বাস করেন না। কাজী শাহ আলম কদলপুর গ্রামে সম্মানিত ব্যক্তি। চারিত্রিক গুণের কারণে হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ নির্বিশেষে সকলেই তাকে শ্রদ্ধা করে। 'কদলপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি' পরিচালিত নৈশ বিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষকতা করেন। গ্রাম্য শালিস, বা এ ধরনের কাজে কাজী শাহ আলম সবসময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন।

কদলপুরবাসী সকলেই কাজী বংশের দুই মুসলিম পরিবারকে খান্দান মুসলিম হিসেবেই মান্য করে। খান্দান মুসলিমদের সমাজে উচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয়। কেননা, তাদের শিক্ষা আছে, জমিজমা আছে, সমাজে আছে গ্রহণযোগ্যতা। প্রসঙ্গত সমাজবিজ্ঞানী আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরীর অভিমত উল্লেখ করা যায়। খান্দানের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন—

> A *khandan* is he who is long associated with ownership and control of land and has at least some education and who can be distinguished from the *girhastas* and *kamlas* by a particular style of life.[৩১]

খান্দান মুসলিমরা মাঠে কাজ করে না, নিজেরা বাজার-পণ্য বহন করে না। খান্দান বংশের নারীরা বোরখা পরিধান না করে বাইরে যায় না। অতীতে এ বংশের মেয়েরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পর আর স্কুল-কলেজে যেত না। কিন্তু এখন এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। কাজী শাহ আলমের কন্যা দিলরুবা সুলতানা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে, দিদারুল আলমের দুই যমজ কন্যা (সুমা আক্তার ও রিমা আক্তার) রাউজান কলেজে পড়ালেখা করে। লক্ষণীয় সুমা, রিমা বা দিলরুবা গ্রামে এলে বোরখা ছাড়া চলাফেরা করে না, কিন্তু কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা বোরখা পরিধান করে না। এ বিষয়ে দিলরুবা সুলতানাকে প্রশ্ন করলে সে জানায় "গ্রামে সবাই আমাকে চেনে। গ্রামবাসী আমার আব্বাকে খুব মান্য করে। এখানে যদি বোরখা ছাড়া রাস্তায় বের হই, তাহলে সেটা আব্বার অপমান হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা আলাদা। সেখানের পরিবেশ ভিন্ন। আর একটা কথা, বিশ্ববিদ্যালয়ে বোরখা পড়লে অনেকেই নেতিবাচক দৃষ্টি দিয়ে তাকায়।"[৩২] এ বিষয়ে সুমা ও রিমাও আমাকে অভিন্ন কথা বলেছে।

Dhaka University Institutional Repository

কাজী শাহ আলম এবং কাজী দিদারুল আলমের পূর্ব-পুরুষের অনেক সম্পদ ছিল, ছিল অনেক জমিজমা। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে অর্থনৈতিক চাপে পরিবারের জমিজমা কমতে থাকে। পারিবারিক কাজে টাকার প্রয়োজন হলে পরিবারদ্বয় কিছু জমি বিক্রি করেছে। কিছু জমি বিক্রি করে এরা দুই ভাই কদলপুর এবং পার্শবর্তী পূর্ব গুজরা ও উত্তর গুজরা গ্রামের মুসলিমদের অনুরোধে একটি মসজিদ স্থাপন করেছে। এখন এই মসজিদে জুমাবারে কদলপুর ছাড়াও পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে মুসলিমরা এসে নামাজ আদায় করেন।

কদলপুর গ্রামের গৃহস্থ বা নিম্নস্তরের মুসলমানরা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল। মোল্লা বংশোদ্ভূত নিম্ন-মর্যাদার গৃহস্থরা প্রধানত কৃষি-শ্রমিক। তারা মাঠে কাজ করে, ভ্যান চালায়, বাজারে তরি-তরকারি বিক্রি করে। একজন গৃহস্থ যুবক চট্টগ্রাম শহরের এক আবাসন কোম্পানিতে রাজমিস্ত্রীর কাজ করে। সপ্তাহে একবার সে বাড়ি আসে, তার পরিবার-পরিজন বাস করে কদলপুরেই। খান্দান মুসলমানদের সঙ্গে গৃহস্থ মুসলমানদের মধ্যে অনেক দিকেই মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। পোষাক-পরিচ্ছদ, কথাবার্তা, চাল-চলন, রুচি ও সংস্কৃতি—যে-কোন দিকেই খান্দান মুসলমানদের মধ্যে আভিজাত্যের ছাপ স্পষ্ট। খান্দান মুসলমান পুরুষ পাজামা-পাঞ্জাবী পরিধান করে, মাথায় টুপি পরে; পক্ষান্তরে গৃহস্থ ঘরের পুরুষ পরিধান করে লুঙ্গি-গেঞ্জি। খান্দান বংশের মহিলারা শাড়ি-ব্লাউজ-পেটিকোট পরে, অন্যদিকে গৃহস্থ নারী কেবল শাড়ি পরে। কাজী বংশের কোনো নারী বাইরে গেলে অবশ্যই বোরখা পরিধান করে, গৃহস্থ নারীর ক্ষেত্রে এ প্রবণতা নেই বললেই চলে। খান্দান মুসলিম নিজেদের মধ্যে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বললেও, প্রয়োজনে তারা প্রমিত বাংলায়ও কথা বলতে পারে। কিন্তু গৃহস্থ মুসলিম প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারে না। নিম্ন-মর্যাদার মানুষদের মধ্যে প্রমিত বাংলা বলার এই সীমাবদ্ধতা বাংলাদেশের সকল গ্রামের জন্যই সত্য। গবেষক আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী মেহেরপুর গ্রামেও লক্ষ করেছেন অভিন্ন চিত্র—

> There is a difference in the way they speak the Bengali language. When a *khandan* speaks to a *girhasta*, he speaks in colloquial language but when he speaks to an outsider, he tries to speak in standard Bengali. The *girhastas* can never speak in standard Bengali. They always speak in colloquial Bengali.[৪৪]

Dhaka University Institutional Repository

ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে কদলপুরের নমঃশূদ্রদের সঙ্গে মুসলিম গৃহস্থদের বেশ মিল খুঁজে পাওয়া যায়। নমঃশূদ্ররাও প্রমিত বাংলার কথা বলতে পারে না। নিজেদের মধ্যে আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে; বাড়িতে বাইরের কেউ এলে তার সঙ্গেও গৃহস্থরা কথা বলে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায়। খান্দানের বাড়িতে গৃহস্থ এলে ঘরে প্রবেশ করে, রান্নাঘরে যায়; তবে পানি চাইলে স্বতন্ত্র গ্লাসে পানি পাবে, যে গ্লাসে খান্দান পরিবারের কেউ পানি পান করে না।

গৃহস্থ পরিবারে শিক্ষার জন্য তেমন আগ্রহ নেই। ছেলে সন্তান বড় হলেই মাঠের কাজে নিয়োজিত হয়; পক্ষান্তরে মেয়েদের বয়স আঠারো পৌঁছার অনেক পূর্বেই বসতে হয় বিয়ের আসনে। গ্রামের গৃহস্থ পরিবারের তিনটি শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে অভিন্ন চিত্র খুঁজে পাই কদলপুর গ্রামের নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝেও।

গৃহস্থ ঘরের নারীরা খুবই পরিশ্রমী। তারা বাড়ি-ঘর পরিষ্কার রাখে, রান্না-বান্না করে, সন্তান প্রতিপালন করে, কখনো-বা মাঠে গিয়ে স্বামীকে সাহায্য করে। গ্রামের গৃহস্থ বধূরা কোনো ধরনের চাকরি করার কথা কল্পনাও করে না। খাওয়া-পরিশ্রম আর ঘুমটাকেই তারা জীবন বলে জানে ও মানে।

মুসলিমদের মধ্যে কোনো নাপিত বা ধোপা থাকার প্রশ্ন ওঠে না। শহরে অবশ্য অনেক মুসলিমই এখন এই দুই পেশা গ্রহণ করেছে। তবে গ্রামের চিত্র একেবারে ভিন্ন। কদলপুর গ্রামের প্রামাণিক আর রজকদাসই মুসলিম পাড়ায় যায় এবং প্রয়োজনীয় কাজ করে অর্থ উপার্জন করে। এটাকে কেউ ধর্মবিরোধী বা জাতিবর্ণের ধারণা বহির্ভূত কাজ বলে মনে করে না।

পাশাপাশি অবস্থান করার ফলে মুসলিম সমাজের স্তরবিন্যাসে হিন্দুদের জাতিবর্ণের প্রভাব পড়েছে। তবে হিন্দুদের চতুর্বর্ণ ব্যবস্থার প্রভাবেই যে মুসলিম সমাজের স্তরবিন্যাসে চারটি পৃথক মর্যাদা গোষ্ঠীর (শেখ, সৈয়দ, মোঘল ও পাঠান) সৃষ্টি হয়েছে, একথা যথার্থ নয় বলে সমাজ-নৃবিজ্ঞানীগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এ. কে. নাজমুল করিম মনে করেন—বাংলাদেশের মুসলিম স্তরবিন্যাসের মূল ভিত্তি হলো বংশমর্যাদা বা খান্দান। E. Gail-ও অভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন।[৩৪] কোনো কোনো সমাজবিজ্ঞানী এই

Dhaka University Institutional Repository

অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে মুসলিম স্তরবিন্যাসের ভিত্তি হল কাল্পনিক বংশমর্যাদা বা খান্দানী বা শরাফতী। বিত্তই হল মুসলিম স্তরবিন্যাসের প্রধান নিয়ামক; একজন ব্যক্তি বিত্তবান হলে সে তার সামাজিক মর্যাদা নানাভাবে বদলাতে পারে, যেটা হিন্দু বর্ণপ্রথায় কখনোই সম্ভব নয়।[৩৩] পক্ষান্তরে এম. এন. শ্রীনিবাস সংস্কৃতায়ন প্রত্যয় দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন, হিন্দু জাতিবর্ণ ব্যবস্থাতেও একজন মানুষ তার সামাজিক মর্যাদা-ভিত্তি পাল্টে দিয়ে উচ্চ-বর্ণে উত্তীর্ণ হতে পারে। আমাদের ধারণায় কাল্পনিক বংশমর্যাদা, ধন-সম্পদ, সামাজিক গতিশীলতা, শিক্ষা এবং হিন্দু চতুর্বর্ণ ব্যবস্থা—এসবের মিথস্ক্রিয়া ও আন্তরক্রিয়ার মধ্য দিয়েই সৃষ্টি হয়েছে মুসলিম সমাজের সামাজিক স্তরবিন্যাস, যার কিছুটা পরিচয় আমরা কদলপুর গ্রামে লক্ষ করেছি।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জাতিবর্ণ ব্যবস্থায় পরিবর্তন-প্রবণতা

জাতিবর্ণ ব্যবস্থা বাংলাদেশের হিন্দু সমাজের সামাজিক স্তরবিন্যাসের মূল ভিত্তি। অতীতে এই ব্যবস্থার কঠোরতা এখন অনেকটা শিথিল হয়ে পড়েছে। বহু সামাজিক সংস্কার ও প্রগতিশীল আন্দোলনের ফলে জাতিবর্ণের কড়াকড়ি আজ অনেকটা কমে এসেছে। শ্রীনিবাসের সংস্কৃতায়ন তত্ত্ব এই কথা প্রমাণ করেছে যে জাতিবর্ণের জন্মগত পরিচয় আজ আর সর্বাংশে সত্য নয়। যে সব কারণে জাতিবর্ণ ব্যবস্থা একালে হীনবল হয়ে পড়েছে, সেগুলো শনাক্ত করা যায় এভাবে—শিল্পায়ন, নগরায়ণ, আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা, আধুনিক অর্থ ব্যবস্থা, আধুনিক আইন ব্যবস্থা ইত্যাদি। সমাজবিজ্ঞানী K. Singh জাতিবর্ণ ব্যবস্থার শিথিলতা ও তার বর্তমান প্রবণতা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে যা বলেছেন, এখানে তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন—

> The caste system in the modern age has undergone several changes. These changes are to be seen in the form of new trends. The trends that are visible in the caste system are of the following types—
>
> 1. Decline of caste supremacy;
> 2. Equality among all castes;
> 3. Relaxation in restrictions on food and drink;
> 4. Weakening of the restrictions relating to marriages;
> 5. Changes in the occupational pattern;
> 6. Improvement in the position of lower castes.[৩৬]

সামাজিক গতিশীলতা ও শিল্পায়নের ফলে পেশাভিত্তিক বর্ণব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। জন্মসূত্রে যে পেশাদার গোষ্ঠী জাতিবর্ণের বৈশিষ্ট্য বহন করতো, আজ সে ধারণায় মৌল পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। যন্ত্রশিল্পের বিকাশ, তথ্য-প্রযুক্তির সহজলভ্যতা, মুদ্রা অর্থনীতির প্রচলন এবং বিশ্বায়ন জাতিবর্ণ ব্যবস্থাকে ফেলে দিয়েছে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে।[৩৭] সনাতন পেশাদার গোষ্ঠী আজ আর বংশানুক্রমিক পেশায় টিকে থাকতে পারছে না। বংশানুক্রমিক পেশায় অবস্থান করলে অনেকের জীবনধারণই অসম্ভব হয়ে পড়বে। তাই অনেকেই পরিত্যাগ করছে বংশানুক্রমিক পেশা। নতুন নতুন শহর পত্তনের ফলে পেশা-পরিবর্তন এখন অনেক সহজ হয়ে গেছে।

Dhaka University Institutional Repository

অতীতে নিচু বর্ণের মানুষেরা ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য উচ্চ-বর্ণের শাসন-শোষণকে নির্বিচারে মেনে দিয়েছে। ব্রাহ্মণ বা অন্যান্য উচ্চ-বর্ণের মানুষকে সেবা করার জন্যই তাদের জন্ম—এই-ই ছিল নিম্ন-বর্ণের মানুষের বদ্ধমূল ধারণা। তাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও তারা মেনে নিয়েছে সংখ্যালঘিষ্ঠের শোষণ-নির্যাতন। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় উপমহাদেশের বিশিষ্ট কমিউনিস্ট সংগঠক ও তাত্ত্বিক বি. টি. রণদিভের বিশ্লেষণ। রণদিভে লিখেছেন—

> হিন্দু সমাজের তথাকথিত নিচু স্তরের বা নিচু জাতের মানুষরাই প্রকৃত পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাহলে এই সংখ্যাগরিষ্ঠরা কেন জাতপাতের বৈষম্যের কলঙ্কমোচন করতে পারলেন না? কেন তাঁরা পারলেন না, কিছু ব্রাহ্মণ কিংবা উঁচু জাতবর্ণের মানুষদের স্বতন্ত্রতাকে ব্যর্থ করে দিতে? বাস্তব সত্য হচ্ছে, জাতবর্ণ বিভাজনের শিকার যারা, তাঁদের নিজেদের মধ্যে জাতবর্ণ বিভাজনের বিষটা যে গভীরভাবে ঢুকে গেছে। তাঁরাও যে আবার বিভক্ত হয়ে পড়েছেন বেশ কিছু জাতবর্ণে। সেই সব জাতবর্ণ আবার বিভক্ত হয়েছে আরও তলার থাকের জাতবর্ণে। নিচু স্তরের জাতবর্ণের সব মানুষই হাড়ে হাড়ে বুঝছেন, উঁচু জাতবর্ণের মানুষদের হাতে তাঁদের কিরকম অন্যায় আচার-আচরণ পেতে হয়েছে, কিন্তু ওঁদের নিজেদেরই ভেতরকার উঁচু থাকের মানুষরা তাঁদের তলার থাকের মানুষদের ওপরে যে-সব অন্যায় আচার-আচরণ করে থাকেন, তার প্রতিবিধান করতে তো প্রস্তুত নন।[৩৮]

বি. টি. রণদিভে যা বলেছেন, এখন সে-অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে। জাতিবর্ণের বিরুদ্ধে বাংলাদেশসহ ভারতের নানা অঞ্চলে চলছে গণতান্ত্রিক লড়াই। সে লড়াইয়ে ক্রমশ যুক্ত হচ্ছে নিম্ন-বর্ণের অধিকারবঞ্চিত মানুষেরা। মহাত্মা গান্ধী আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন অস্পৃশ্যতা প্রথার বর্জন, আবার চতুর্বর্ণ ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন। তিনি বলেছেন, চতুর্বর্ণের চেয়ে আরো সুসমন্বিত ব্যবস্থা কল্পনা করা শক্ত। কোনো জাতের উৎকৃষ্টতা বা কোনো জাতের অপকৃষ্টতা জাত ব্যবস্থার গূঢ়ার্থ নয়।[৩৯] কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের কাছে আমরা শুনি ভিন্ন কথা। রামকৃষ্ণের পরম শিষ্য এই ঋষি একই সঙ্গে ধর্মবেত্তা এবং সমাজতাত্ত্বিক-রাজনৈতিক ভাষ্যকার। তাই অধ্যাত্ম সাধনায় নিরত থেকেও তিনি অকপটে বলতে পারেন নিম্ন-বর্ণের মানুষের সামূহিক জাগরণ বিষয়ক এই ইতিবাচক সম্ভাবনার কথা—

Dhaka University Institutional Repository

> প্রোলেতারিয়েত শ্রেণী মূল উৎপাদন প্রণালীর সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও উৎপাদনের সমূহ ফল থেকে বঞ্চিত এবং বাধ্যতামূলক মজুরিশ্রম বিক্রয়ের মাধ্যমে কোনো মতে বাঁচার তপস্যায় নিয়োজিত। শূদ্র শ্রেণীর আর্থ-সামাজিক অস্তিত্বের প্রকৃতিও তাই। এর থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় : শূদ্ররা একটা শোষিত শ্রেণী। কিন্তু তাঁরা চিরকাল শোষণের শিকার হন না। তাঁরাও এক সময় শাসন কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত হন : মানব সমাজ ক্রমান্বয়ে চারটি বর্ণ দ্বারা শাসিত হয়—পুরোহিত (ব্রাহ্মণ), সৈনিক (ক্ষত্রিয়), ব্যবসায়ী (বৈশ্য), এবং মজুর (শূদ্র)।...সর্বশেষে শূদ্রশাসন যুগের আবির্ভাব হবে—শূদ্র যুগ আসবেই আসবে—এ কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না।[৪০]

'তথাকথিত নিচুজাত বলে কিছু নেই প্রকৃত হিন্দু ধর্মে।'—এই দাবি উচ্চারণ করে যারবেদা কারাগারে আমরণ অনশন করেছিলেন মহাত্মা গান্ধী, সত্তর বছর পূর্বে। তারপর গঙ্গা-পদ্মায় বহু জল গড়িয়েছে, কিন্তু জাতিবর্ণ সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়নি। জাতিবর্ণ ব্যবস্থার বহুমুখী পরিবর্তন ঘটেছে, তবু এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনায় পড়েছে, এমন ভাবার কোনো অবকাশ নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় K. Singh-এর এই ভাষ্য—

> Thus in recent years caste-system has changed its patterns Restrictions that went with the caste sometimes ago are getting relaxed. In spite of it, it cannot be said that the caste system has come to an end. It will undergo further change in future. It will disintegrate only when the democratic values get deep rooted and the country makes good deal of economic progress and industrial advancement then new economic and political structure will emerge and it will change the pattern of the caste system.[৪১]

জাতিবর্ণ ব্যবস্থার সাম্প্রতিক প্রবণতা ও ভবিষ্যৎ গতি-প্রকৃতি বিষয়ক আলোচনা শেষে কদলপুর গ্রামের দিকে তাকালে কী দেখতে পাবো আমরা? ইতঃপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, জাতিবর্ণের সনাতন ধারণা কদলপুর গ্রামে অনেক ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত। নানা বর্ণের মধ্যে এখন বিয়ে হচ্ছে, বংশানুক্রমিক পেশা পরিত্যাগ করে অনেকেই ইচ্ছা মতো নতুন কোন পেশার সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে। আন্তঃআহারও আজ আর খুঁজে পাওয়া যাবে

Dhaka University Institutional Repository

না। যুব সম্প্রদায় জাতিবর্ণের বিধি-নিষেধকে গ্রাহ্য করতে চায় না। বেঁচে থাকার জন্য নিম্ন-বর্ণের হিন্দু কিংবা নমঃশূদ্ররা বিভিন্ন পেশা গ্রহণ করছে।

কদলপুর গ্রামের জাতিবর্ণের পরিবর্তনের সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে নারী সমাজের উপর। জাতিবর্ণে নারীর অস্তিত্ব প্রবলভাবে অস্বীকৃত। এ প্রেক্ষাপটে কদলপুর গ্রামের নারীসমাজের দিকে তাকালে দেখতে পাই, তারা ক্রমশ সাবলম্বী হয়ে উঠছে। অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী হয়ে ওঠার অর্থই হলো জাতিবর্ণের শিকড়ে কুঠারের আঘাত হানা। গ্রামের দুঃস্থ নারী-পুরুষকে নৈশ বিদ্যালয়ে অক্ষরজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার মধ্য দিয়েও সনাতন বর্ণ ব্যবস্থার মূলে আঘাত হানা হয়েছে।

নমঃশূদ্র পাড়াতেও লেগেছে পরিবর্তনের হাওয়া। অনেকেই এখন বংশানুক্রমিক পেশা পরিত্যাগ করে নতুন পেশায় অভ্যস্থ হয়ে উঠছে। বিয়ের ক্ষেত্রেও খানিকটা শিথিলতা এসেছে। এখন ভিন্ন বর্ণের নারী-পুরুষের মধ্যে মাঝে মাঝে বিয়ে হচ্ছে। তবে মুসলিম পাড়ায় ভিন্ন ছবি। সেখানে খান্দান বংশের সঙ্গে গৃহস্থ ঘরের ছেলে বা মেয়ের বিয়ে কল্পনাও করা যায় না।

বিয়ে, শ্রাদ্ধ বা এ ধরনের কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে আন্তঃআহারের ধারণাও এখন বদলে গেছে। এখন হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ এক আসরে বসে এক অন্ন গ্রহণ করে থাকে। কদলপুর গ্রামে এই দৃশ্য দেখে আমরা গর্ব অনুভব করেছি। সরকার পাড়ার শ্রী নারায়ণ চন্দ্র সরকার বাটিস্থ মাতৃমণ্ডপে দুর্গাপূজার সময় আমি দেখেছি, পূজার আনন্দে বর্ণ-ব্যবস্থার সব বন্ধন ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেছে।

449625

এতসব পরিবর্তন ঘটেছে, তবু একথা কি বলা যাবে—বর্ণ ব্যবস্থা কদলপুর গ্রামে নেই? না, সেকথা বলা সম্ভব নয়। এখনও এ গ্রামের মানুষ নানা অনুষঙ্গে বর্ণ-ব্যবস্থার কঠিন শাসন মেনে চলে। যে-মানুষ আজ সামাজিক সচলতার কথা বললো, দেখা গেল আগামী কালই সে নিজের মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে হয়ে উঠেছে ঘোরতর বর্ণবাদী। বর্ণব্যবস্থা মিশে আছে গ্রামবাসীদের মর্মে সত্তায় স্মৃতিতে। প্রসঙ্গত V. S Naipaul-এর একটি স্মৃতি-অনুষঙ্গ দিয়ে আমরা এ আলোচনার সমাপ্তি টানতে পারি। Naipaul লিখেছেন—

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

Men might rebel ; but in the end they usually make their peace. There is no room in India for outsiders. The Arya Samaj, the Aryan Association, a reformist group opposed to traditional ideas of caste, and active in north India earlier in the century, failed for a simple reason. It couldn't meet the marriage needs of its members ; India called them back to the castes and rules they had abjured. And five years ago in Delhi I heard this story. A foreign businessman saw that his untouchable servant was intelligent, and decided to give the young man an education. He did so, and before he left the country he placed the man in a better job. Some years later the businessman returned to India. He found that his untouchable was a latrine-cleaner again. He had been boycotted by his clan for breaking away from them; he was barred from the evening smoking group. There was no other group he could join, no woman he could marry. His solitariness was insupportable, and he had returned to his duty, his *dharma*; he had learned to obey.[৪২]

তথ্যনির্দেশ

১. বিস্তৃত বিবরণের জন্য দেখুন—মুহাম্মাদ হাবিবুর রহমান, *সমাজবিজ্ঞান পরিচিতি*, (ঢাকা : হাসান বুক হাউস, ২০০৯), পৃ. ৫৫০-৫৩

২. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস —আদিপর্ব*, (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, দ্বি. সং. ১৪০২), পৃ. ৭০০-০১

৩. অনুপম সেন, "আদি-অন্ত বাঙালি : বাঙালি সত্তার ভূত-ভবিষ্যৎ", বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী বক্তৃতা, ৩রা ডিসেম্বর ২০০৮, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৭

৪. রামকৃষ্ণ মুখার্জী, *বাংলার ছটি গ্রাম* (ঢাকা : জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট, ১৯৯৭), পৃ. ৩৮

৫. রংগলাল সেন, *বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাস* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, দ্বি. সং. ১৯৯৭), পৃ. ২৮

৬. কদলপুর গ্রামের মিনতিবালা দাস আমাকে জানিয়েছেন যে, 'ভোগ' হচ্ছে দেবতার প্রসাদ। 'ভোগের' অপমান বা অপবিত্র করা হচ্ছে দেবতাকেই অপমান করা। তাই

Dhaka University Institutional Repository

ভোগ গ্রহণকালে তারা স্নান সমাপন্তে শুদ্ধ কাপড় পরিধান করে। 'ভোগ' আহার করার পর তারা হাত-মুখ জল দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নেয়। মিনতিবালা আরো জানিয়েছেন যে, রজঃস্বলা অবস্থায় কোনো নারী ভোগ গ্রহণ করে না, মন্দিরে যেতে পারে না—কেননা, ওই অবস্থায় নারী নিজেকে অপবিত্র ভাবে। অপবিত্র দেহ নিয়ে দেবতার কোনো প্রসাদ সে নেয় না, এমনকি মন্দিরের কাছেও সে যায় না।

৭. কদলপুর গ্রামের মাশ্রাধী ব্রাহ্মণ বিপুল আচার্যের এই করুণ পরিণতির কথা আমাকে জানিয়েছেন তারই প্রতিবেশী বয়োজ্যেষ্ঠ শ্রী সন্তোষকুমার আচার্য। সন্তোষকুমার আচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের তারিখ : ১২. ১২. ২০০৮

৮. দৈনিক কালের কণ্ঠ, ঢাকা, ৬ই জুন ২০১০। পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টটিতে বলা হয়—"সনাতন সমাজে জাত প্রথাজনিত হত্যাকে 'অসম্মানজনক' আচরণের শাস্তি বলে যথার্থতা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। জোরপূর্বক বিয়ে ও জাত প্রথাজনিত হত্যা পরস্পর সম্পর্কিত। ভারতে জাত বাঁচানোর অজুহাতে, বিশেষ করে নারীদের জোর করে বিয়ে দেওয়া হয়। বিয়েতে রাজি না হলে কিংবা পছন্দের মানুষকে বিয়ে করতে চাইলে তাদের প্রথমে নির্যাতন করা হয়। তাতেও কাজ না হলে 'সম্মান রক্ষায়' নারীদের হত্যা করা হয় কিংবা নিজেরাই আত্মহত্যা করে থাকে।"

৯. Veena Das, *Structure and Cognition : Aspects of Hindu Caste and Ritual* (Delhi : Oxford University Press, 1990), p. 63

১০. Veena Das, ibid, P. 63

১১. রামকৃষ্ণ মুখার্জী, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নম্বর ৪, পৃ. ৩২৮

১২. গ্রামের প্রবীণ পুরোহিত শ্রী আশুতোষ চক্রবর্তী জানান যে, গ্রামে উচ্চ-বর্ণের মধ্যে সরকাররা সবার উপরে আছে। এরপর যথাক্রমে চৌধুরী, দত্ত, দে, এবং তালুকদার। মন্দির স্থাপন, অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা এবং সরকার পদবীধারী কয়েকজন ব্যক্তির নেতৃত্বগুণ ঐ বংশটিকে উচ্চ-বর্ণের মাঝে শীর্ষ অবস্থানে পৌঁছে দিয়েছে বলে শ্রী আশুতোষ চক্রবর্তী মনে করেন। শ্রী আশুতোষ চক্রবর্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের তারিখ : ১৭. ১২. ২০০৮

১৩. কদলপুর গ্রামের প্রবীণ সদস্য শ্রী বীরেন্দ্র লাল দত্ত এ তথ্য আমাকে জানিয়েছেন। বীরেন্দ্র লাল দত্তের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের তারিখ : ১০. ০১. ২০০৭

১৪. শিশুর মুখে প্রথম অন্ন তুলে দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, তাকে বলে অন্নপ্রাশন। বাড়িতে বা মন্দিরে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ব্রাহ্মণ পূজা দিয়ে তার হাতে শিশুর মুখে অন্ন তুলে দেন। এ অনুষ্ঠানে কখনো কখনো শিশুর নাম চূড়ান্তভাবে রাখা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৫. শ্রী আশুতোষ চক্রবর্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ১২.০১.২০০৭

১৬. 'কোষ্ঠী' হচ্ছে জন্ম-পত্রিকা। কোষ্ঠীতে শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের শুভ-অশুভ সবকিছু লেখা থাকে। একজন ব্রাহ্মণ শিশুর জন্মের সময় গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান ও তিথি বিচার করে 'কোষ্ঠী' তৈরি করেন। উত্তরকালে নানা কাজে এই কোষ্ঠীর প্রয়োজন হয়।

১৭. শ্রী আশুতোষ চক্রবর্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্য। সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ১৪. ০১.২০০৭

১৮. 'শ্রাদ্ধ' হচ্ছে এক ধরনের ধর্মীয় কৃত্যমূলক অনুষ্ঠান। হিন্দু ধর্মমতে মৃতের আত্মার কল্যাণ কামনায় পিণ্ডদানাদি অনুষ্ঠানের নামই শ্রাদ্ধ। এ অনুষ্ঠানে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে অন্নাদি দান করা হয়। ভাবা হয়, শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান না হওয়া পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির আত্মা মুক্তি লাভ করে না।

১৯. এ বিষয়ে তরুণ সঙ্ঘের সভাপতি শ্রী গোবিন্দ সরকার বলেন—এখন এ প্রথা মানা আর সম্ভব নয়। সমাজ অনেক অগ্রসর হয়েছে। এখন এই প্রাচীন বিভাজন মানুষ মানতে চায় না। তবে আমরা যতই এটা না মানার চেষ্টা করি না কেন, নমঃশূদ্ররা নিজেদের সব সময় অধঃস্তনই ভাবে। শ্রী গোবিন্দ সরকারের সঙ্গে সাক্ষৎকারে প্রাপ্ত তথ্য। সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ২০. ০১. ২০০৭

২০. Anwarullah Chowdhury, *A Bangladesh Village: A Study of Social Stratification* (Dhaka : Centre for Social Studies, 1978), p. 99

২১. অধিকাংশ ক্ষেত্রে একই ধরনের বিধি-বিধান পালন করে থাকে বলে নিম্ন-বর্ণের হিন্দুদের ওইসব কৃত্য সম্পর্কে পৃথক ভাবে বলা হয় নি। পুনরাবৃত্তি থেকে মুক্ত থাকার জন্যই এটা করা হয়েছে।

২২. শ্রী আশুতোষ চক্রবর্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ১৫.০১.২০০৭

২৩. হারাধন মণ্ডলের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্য। সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ২২.০১.২০০৭

২৪. Anwarullah Chowdhury, ibid, note No. 20, p. 99

২৫. K. S. Singh, *The Scheduled Caste* (Delhi : Oxford University Press, 1993), p. 17

২৬. A. K. Nazmul Karim, *The Dynamics of Bangladesh Society* (Dacca : Nawroze Kitabistan, 1980), pp. 127-28

২৭. J. D. Cunningham, *A History of the Sikhs* (Calcutta : Sanyal and co., 1903), p. 31

Dhaka University Institutional Repository

২৮. William Crooke (editor), *Qarum-i-Islm* by Jafor Sharif (London : Penguin Books, 1921), p. 13

২৯. এ বিষয়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যার জন্য দেখুন—হেলালউদ্দিন খান আরেফিন, "বাংলাদেশের মুসলিম স্তরবিন্যাসের ধারা", *সমাজ নিরীক্ষণ*, সংখ্যা ১৪, ১৯৮৪; সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, পৃ. ৩৪-৬৭

৩০. কাজী শাহ আলমের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্য। সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ১৭. ০৪. ২০০৯

৩১. Anwarullah Chowdhury, ibid, note No. 20, pp. 87-88

৩২. কাজী শাহ আলমের কন্যা দিলরুবা সুলতানার সঙ্গে সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ১৭. ০৪. ২০০৯

৩৩. Anwarullah Chowdhury, ibid, note No. 29, p. 87

৩৪. E. Gait, *Census of India—1901* (Calcutta, 1902), Vol. 6, part-1, p. 193

৩৫. হেলালউদ্দিন খান আরেফিন, "বাংলাদেশের মুসলিম স্তরবিন্যাসের ধারা", পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭

৩৬. K. Singh, *Social and Cultural Anthropology* (Lucknow : Prakashan Kendra, 1993), p. 213

৩৭. মুহাম্মাদ হাবিবুর রহমান, পূর্বোক্ত, পাদটীকা নম্বর ১, পৃ. ৫৫৩

৩৮. বি. টি. রণদিভে, *জাত বর্ণ শ্রেণী এবং সম্পত্তিগত সম্পর্ক* (কলকাতা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৯), পৃ. ১৫

৩৯. বি. টি. রণদিভে, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮-৫৯

৪০. স্বামী বিবেকানন্দ, *জাতি, সংস্কৃতি ও সমাজতত্ত্ব* (কলকাতা : উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৮৬), পৃ. ৫৮

৪১. K. Singh, ibid, note No. 36, p. 215

৪২. V. S. Naipaul, *India : A Wounded Civilization* (Calcutta : Penguin Books, 1977), pp. 171-72.

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

জাতিবর্ণ ব্যবস্থা ভারতীয় সমাজকাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। জাতিবর্ণের দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ ভারতীয় হিন্দু জনগোষ্ঠী। সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধারায় ভারতীয় জাতিবর্ণ ব্যবস্থাকে সমাজ-নৃবিজ্ঞানীরা অনন্য (unique) ব্যবস্থা বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এ ব্যবস্থার ফলে ভারতীয় সমাজে একদিকে যেমন সৃষ্টি হয়েছে সংহতি ও শৃঙ্খলা, আবার অন্যদিকে তা সৃষ্টি করেছে সামাজিক দ্বন্দ্ব ও নানামাত্রিক অসমতা। নানামাত্রিক পরিবর্তনের ফলে ভারতীয় জাতিবর্ণ ব্যবস্থায় এখন বহু ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে। জাতিবর্ণের কঠোর-কঠিন নিয়ম-কানুন এখন অনেকটা শিথিল হয়ে পড়েছে। বর্তমান অভিসন্দর্ভে চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানাধীন কদলপুর গ্রামের জাতিবর্ণ ব্যবস্থার উপর আলোকপাত করা হয়েছে। সনাতন জাতিবর্ণ ব্যবস্থায় যে চতুর্বর্ণের কথা পাওয়া যায় সেগুলো হচ্ছে—(ক). ব্রাহ্মণ, (খ). ক্ষত্রিয়, (গ). বৈশ্য, এবং (ঘ). শূদ্র। আর এই চারবর্ণের বাইরে যারা, তাদের বলা হতো নমঃশূদ্র। বর্ণ-ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণরা সামাজিক স্তরবিন্যাসের সবচেয়ে উচ্চে অবস্থান করে আর নমঃশূদ্ররা সবচেয়ে নিচে। নমঃশূদ্ররা জাতিবর্ণের দৃষ্টিতে অস্পৃশ্য। কদলপুর গ্রামে সনাতন চতুর্বর্ণ ব্যবস্থা আজ আর অবশিষ্ট নেই। কেবল কদলপুর নয়, বাংলাদেশের কোন গ্রামেই সনাতন চতুর্বর্ণ ব্যবস্থা এখন আর দেখতে পাওয়া যায় না।

সনাতন চতুর্বর্ণের ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য বর্ণ মিলে কালক্রমে উচ্চ-বর্ণের হিন্দু এবং নিম্ন-বর্ণের হিন্দু—এই দু'টি স্তরের সৃষ্টি হয়েছে। কদলপুর গ্রামেও আমরা এই দুই বর্ণের সাক্ষাৎ পেয়েছি। কদলপুর গ্রামের হিন্দু জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত বর্ণব্যবস্থা বর্তমানে নিম্নরূপ—(ক). উচ্চ-বর্ণ, (খ). নিম্ন-বর্ণ এবং (গ). নমঃশূদ্র। উচ্চ-বর্ণের মাঝে আবার পাওয়া যাবে দুটো বিভাজন—১. ব্রাহ্মণ, ২. অন্যান্য উচ্চ-বর্ণ। জন্ম, বিয়ে, মৃত্যু, পারলৌকিক কৃত্য, ধর্মীয় বিধি-বিধান ইত্যাদি ক্ষেত্রে বর্ণসমূহের মধ্যে কখনো সাদৃশ্য কখনো বৈসাদৃশ্য দেখা গেছে, যা অভিসন্দর্ভে বিস্তৃতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

কদলপুর গ্রামে মুসলিম সমাজেও অদৃশ্য জাতিবর্ণ ব্যবস্থা ক্রিয়াশীল। মুসলিমরা অভিজাত এবং গৃহস্থ—এই দুই ভাগে বিভক্ত। অভিজাত মুসলিমরা শিক্ষা লাভ করে গ্রামের সীমানা অতিক্রম করে শহরমুখী হয়ে উঠছে। গৃহস্থ মুসলিমরা কায়িকশ্রম করে

Dhaka University Institutional Repository

জীবিকা নির্বাহ করে। গ্রামের অভিজাত মুসলিমরা সকলের কাছেই সম্মানীয়, কিন্তু গৃহস্থ ঘরের মুসলিমদের মর্যাদা অনেকটা নিম্ন-বর্ণের হিন্দুদের অনুরূপ। মর্যাদাসম্পন্ন মুসলিমরা যেভাবে ধর্মীয় বিধি-বিধান পালন করেন, গৃহস্থ মুসলিমরা সেভাবে তা পালন করে না।

নানামাত্রিক পরিবর্তনের ফলে কদলপুর গ্রামের সনাতন বর্ণব্যবস্থা এখন ভেঙে পড়ছে। তবু জন্ম, বিয়ে, মৃত্যু—এসব অনুষঙ্গে এখনো এ ব্যবস্থার উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। গ্রামের সাধারণ মানুষ নিত্য-নৈমিত্তিক কাজে বর্ণ-ব্যবস্থাকে ভুলে থাকলেও জন্ম, বিয়ে, মৃত্যু-উত্তর পারলৌকিক কাজে এখনো জাতিবর্ণ ব্যবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বিশেষত, বিয়ের ক্ষেত্রেই জাতিবর্ণের শাসন এখনো তীব্র। এক বর্ণের সঙ্গে অন্য বর্ণের বিয়ে সামাজিকভাবে ভালো চোখে দেখা হয় না। এসব ক্ষেত্রে গ্রামের মানুষ পূর্বের মতো বিশেষ কোনো পরিবারকে এক ঘরে করে রাখে না বটে, তবে সকলেই ঐ পরিবারের সঙ্গে অন্য কোনো বিয়ে এড়িয়ে চলে। হিন্দু-মুসলিম উভয় ক্ষেত্রেই এটাও দেখা গেছে যে, যদি নিম্ন-মর্যাদার কেউ উচ্চ-মর্যাদাসম্পন্ন পরিবারের কোনো সদস্যকে বিয়ে করে, তাহলে নিম্ন-মর্যাদার লোকেরা খুশি হয়; পক্ষান্তরে উচ্চ-মর্যাদাসম্পন্ন পরিবার ও তার পরিজনেরা সামাজিকভাবে নিজেদের বিপন্ন বোধ করে।

কদলপুর গ্রামের জাতিবর্ণ ব্যবস্থায় বর্ণের উপস্থিতি থাকলেও জাতি-ধারণা তেমন একটা পাওয়া যায় নি। ব্রাহ্মণ ও নিম্ন-বর্ণের হিন্দুদের মধ্যে জাতি ধারণা এখনো ক্রিয়াশীল। এ কারণে একই বর্ণভুক্ত হলেও দাস, ভূইমালী, প্রামাণিক, রজকদাস ও বণিকের মধ্যে পারস্পরিক বিয়ে এখনো নিষিদ্ধ। আন্তঃবিবাহের মতো আন্তঃআহারের ক্ষেত্রেও এখনো কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিভাজন লক্ষ করা যায়। মুসলিম সমাজেও খান্দান পরিবারের সঙ্গে গৃহস্থ পরিবারের বিয়ে সমাজ-অস্বীকৃত। উচ্চ-বর্ণের, নিম্ন-বর্ণের বা নমঃশূদ্র হিন্দু, এমন কি মুসলিম সমাজ—সর্বত্রই লক্ষ করা গেছে 'সমাজ' একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হিন্দু-মুসলিম উভয়েই সমাজের চাপে গ্রামে বসে বিধি-বিরোধী যে-কাজ করে না, অন্যত্র গিয়ে তা করে থাকে।

সামাজিক ক্ষেত্রে এখন বহুমাত্রিক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। তথ্য-প্রযুক্তির এই যুগে অনেক ভ্রান্ত ধারণা থেকে মানুষের মুক্তি ঘটেছে। মানুষে-মানুষে বৈষম্যও এখন অনেকটা দূর হয়েছে। এসব কারণে জাতি-বর্ণ ব্যবস্থায় দেখা দিয়েছে নানামাত্রিক শিথিলতা। কদলপুর গ্রামেও অনুভব করা গেছে এই শিথিলতার হাওয়া।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

সহায়ক বাংলা গ্রন্থ

অতুল সুর
১৯৮২ — *বাঙলার সামাজিক ইতিহাস*, কলকাতা : জিজ্ঞাসা

অতুল সুর
১৯৮৬ — *বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন*, কলকাতা : সাহিত্যালোক

অনাদিকুমার মহাপাত্র
১৯৯৮ — *বিষয় সমাজতত্ত্ব*, কলকাতা : ইন্ডিয়ান বুক কনসার্ন

অনুপম সেন
১৯৯৯ — *বাংলাদেশ : রাষ্ট্র ও সমাজ*, ঢাকা : অবসর

অনুপম সেন
২০০৮ — *ব্যক্তি ও রাষ্ট্র : সমাজ-বিন্যাস ও সমাজ-দর্শনের আলোকে*, ঢাকা : অবসর

ইয়েনেকা আরেন্স
ও
ইওস ফান ব্যুরদেন
১৯৯৮ — *ঝগড়াপুর : গ্রামবাংলার গৃহস্থ ও নারী* (অনুবাদ : নিলুফার মতিন), ঢাকা : গণপ্রকাশনী

ইরফান হাবিব
১৯৯৯ — *ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গ* (অনুবাদ : কাবেরী বসু), কলকাতা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড

এ. এফ. ইমাম আলী
১৯৯৮ — *সমাজতত্ত্ব*, ঢাকা : ইনস্টিটিউট অব অ্যাপলায়েড অ্যানথ্রোপলজি

এ. কে. নাজমুল করিম
১৯৮৯ — *সমাজবিজ্ঞান সমীক্ষণ*, ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান

এ. আর. দেশাই
১৯৯২ — *ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক পটভূমি*, কলকাতা : কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী

কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায়
২০০০ — *নারী শ্রেণী ও বর্ণ*, কলকাতা : ম্যানাক্সিপ্ট ইন্ডিয়া

কামরুদ্দীন আহমদ
২০০২ — *পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স

জেমস ওয়াইজ
২০০০ — *পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশার বিবরণ* (১-২ভাগ), (অনুবাদ : ফওজুল করিম), ঢাকা : ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর বেঙ্গল স্টাডিজ

Dhaka University Institutional Repository

নরেন্দ্রকুমার মণ্ডল ১৯৯৯ — *মহাবিশ্বে মানুষ ও ধর্ম* , ঢাকা : অনিন্দ্য

নীহাররঞ্জন রায় ১৯৯৩ — *বাঙালীর ইতিহাস —আদি পর্ব* , কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং

প্রাণকুমার ভট্টাচার্য্য (সম্পা.) ১৯৯০ — *শ্রীমদ্ভগবদগীতা*, ঢাকা : নিউ এজ পাবলিকেশন্স

পরিমলভূষণ কর ১৯৮৮ — *সমাজতত্ত্ব* , কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

বি. টি. রণদিভে ১৯৯৯ — *জাত বর্ণ শ্রেণী এবং সম্পত্তিগত সম্পর্ক*, কলকাতা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড

বিনয় ঘোষ ১৯৭৯ — *বাংলার নবজাগৃতি*, কলকাতা : ওরিয়েন্ট লংম্যান

বিনয় ঘোষ ২০০০ — *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা* , ঢাকা : বুক ক্লাব

ভূপেন্দ্র দত্ত ১৯৮৪ — *ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি (১-৩ খণ্ড)* , কলকাতা : নবভারত পাবলিশার্স

মুহাম্মাদ হাবিবুর রহমান ১৯৯৫ — *সামাজিক অসমতা : তত্ত্ব ও গবেষণা*, ঢাকা : হাসান বুক হাউস

মুহাম্মাদ হাবিবুর রহমান ২০০৯ — *সমাজবিজ্ঞান পরিচিতি*, ঢাকা : হাসান বুক হাউস

রংগলাল সেন ১৯৮৫ — *বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাস*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী

রংগলাল সেন ও বিশ্বম্ভর কুমার নাথ ২০০২ — *প্রারম্ভিক সমাজবিজ্ঞান* , ঢাকা : নিউ এজ পাবলিকেশন্স

রমেশচন্দ্র দত্ত ১৮৮৬ — *ঋগ্বেদ সংহিতা*, কলকাতা : ঈশ্বরচন্দ্র বসু

রামকৃষ্ণ মুখার্জী ১৯৯৭ — *বাংলার ছ'টি গ্রাম*, ঢাকা : জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট

রামশরণ শর্মা ১৯৮৯ — *প্রাচীন ভারতে শূদ্র*, কলকাতা : কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী

Dhaka University Institutional Repository

রেবতী বর্মণ
১৯৮৭
সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ, ঢাকা : প্রকাশ ভবন

রোমিলা থাপার
২০০২
ভারতবর্ষের ইতিহাস, কলকাতা : ওরিয়েন্ট লংম্যান

সুকোমল সেন
১৯৯৩
ভারতে সভ্যতা ও সমাজবিকাশে ধর্ম শ্রেণী ও জাতিভেদ, কলকাতা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি

সুজিত সেন (সম্পাদক)
১৯৮৯
জাতপাতের রাজনীতি, কলকাতা : পুস্তক বিপনি

সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়
১৯৯১
সমাজ জাতি ও দ্বন্দ্ব, কলকাতা : মডার্ন কলাম

স্বরোচিষ সরকার
২০০৫
অস্পৃশ্যতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ, ঢাকা : প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা

স্যামুয়েল কোনিগ
২০০২
সমাজবিজ্ঞান (বংগলাল সেন অনূদিত), ঢাকা : জে. কে. প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
১৯৭০
গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা, কলকাতা : জিজ্ঞাসা

সহায়ক ইংরেজি গ্রন্থ

A. F. Imam Ali
1992
Hindu-Muslim Community in Bangladesh, Delhi : Kanishka Publishing House

A. K. Nazmul Karim
1980
The Dynamics of Bangladesh Society, Dacca : Nawroze Kitabistan

A. K. Nazmul Karim
1996
Changing Society in India, Pakistan and Bangladesh, Dhaka : Nawroze Kitabistan

Andre Beteille
1996
Caste Class and Power : Changing Patterns of Stratification in a Tangore Village, Delhi : Oxford University Press

Anwarullah Chowdhury
1978
A Bangladesh Village : A Study of Social Stratification, Dacca : Centre for Social Studies

Bronislaw Malinowski
1978
Argonauts of the Western Pacific, London : Routledge & Kegam paul

J. H. Hutton
1968
Caste in India, Bombay : Oxford University Press

Dhaka University Institutional Repository

K. M. Panikkar 1955 — *Hindu Society at Crossroads*, Delhi : Oxford University Press

G. S. Ghurye 1996 — *Caste and Race in India*, Bombay : Popular Prakashan

H. H. Risley 1908 — *The Peoples of India*, London : W. Thacker Co.

Hasnat Abdul Hye (ed.) 1985 — *Village Studies in Bangladesh*, Comilla : Bangladesh Academy for Rural Development

Arnold Green 1981 — *Sociology*, London : Heinemann

C. H. Colley 1981 — *Social Organization*, Bombay : Oxford University Press

G. A. Lundberg 1978 — *Foundations of Sociology*, London : Free Press

K. Singh 1993 — Social and Cultural*Anthropology*, Lucknow : Prakashan Kendo

Don Martindale 1960 — *The Nature and Types of Sociological Theory*, Boston : Huughton Miffin Company

D. D. Kosambi 1990 — *An Introduction to the Study of Indian History*, Bombay : Vikas Publishing House Pvt. Ltd.

K. S. Singh 1993 — *The Scheduled Caste*, Delhi : Oxford University Press

Kusum K. Premi 1989 — *Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Industrial Training Institutes*, New Delhi : Vikas Publishing House Pvt. Ltd.

Louis Dumont 1998 — *Homo Hierarchicus : The Caste System and Its Implications*, Delhi : Oxford University Press

K. M. Kapadia 1994 — *Marriage and Family in India*, Calcutta : Oxford University Press

Max Weber 1958 — *The Religion of India : The Sociology of Hinduism and Buddhism* (English translation by Hans H. Garth and Don Martindale), Glencoe : Orient

M. N. Srinivas 1996 — *Village, Caste, Gender and Method*, Delhi : Oxford University Press

M. N. Srinivas 1996 — *Caste : Its Twentieth Century Avatar*, New Delhi : Viking

M. N. Srinivas 1998 — Social Change in Modern India, Bombay : Asia Publishing House.

Pierre Bessaignt (editor) 1960 — *Social Research in East Pakistan*, Asiatic Society of Pakistan

Dhaka University Institutional Repository

Vincent A. Smith 1961 — *The Oxford History of India*, Oxford : Oxford University Press

Vidyabhushan and D. R. Sachadeva 1980 — *An Introduction to Sociology*, Allahabad : Kitabmahal

Setadal Das Gupta 1993 — *Caste Kinship and Community*, Hyderabad : University Press

T. B. Bottomore 1975 — *Sociology : A Guide to Problems and Literature*, New Delhi : Blackie & Son (India) Ltd.

Veena Das 1990 — *Structure and Cognition : Aspects of Hindu Caste and Ritual*, Delhi : Oxford University Press

R. M. MacIver 1978 — *Society : A Text Book of Sociology*, London : Macmillan

Romila Thapar 1996 — *A History of India* (Vol. II), Middlesex : Penguin Books

V. S. Naipaul 1977 — *India : A Wounded Civilization*, New Delhi : Penguin Books

W. A. Anderson and F. B. Parker 1968 — *Society : Its Organization and Operation*, New York : Doubleday

W. Hendricks Wiser 1956 — *The Hindu Jajmani System : A Socio-Economic System Interrelating Members of a Hindu Village Community in Services*, Lucknow : Lucknow Publishing House

সহায়ক প্রবন্ধপঞ্জি

- অনুপম সেন, "আদি-অন্ত বাঙালি : বাঙালি সত্তার ভূত-ভবিষ্যৎ", প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী বক্তৃতা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ৩রা ডিসেম্বর ২০০৮
- এ. এফ. ইমাম আলী, "বাংলাদেশের গ্রামীণ সামাজিক স্তরবিন্যাস : একটি পর্যালোচনা", *চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ*, ত্রয়োদশ খণ্ড : প্রথম সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯২, চট্টগ্রাম
- মনোহর বিশ্বাস, "জাতিভেদ : সেকাল ও একাল", *জিজ্ঞাসা* (সম্পাদক : শিবনারায়ণ রায়), দ্বাবিংশ সংখ্যা, ১৩৭৮, কলকাতা

Dhaka University Institutional Repository

- হেলালউদ্দিন খান আরেফিন, "বাংলাদেশের মুসলিম স্তরবিন্যাসের ধারা", *সমাজ নিরীক্ষণ*, সংখ্যা ১৪; ১৯৮৪, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

- A. F. Imam Ali, " Education Among The Jalo Das — A Hindu Fishing Caste of the Coastal Area of Chittagong, Bangladesh", *The Journal of The Institute of Bangladesh Studies* Vol. XV, 1992, Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi University, Rajshahi

- Andre Beteille, "The Tribulation of Fieldwork", *Economic and Political Weekly*, Nos. 31-33, Delhi, 1969.